নীলপাঞ্জা লালবাদশা

নিগূঢ়ানন্দ

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৯ সাল॥

প্রকাশক :
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২।

মুদ্রক :
'একৃমি প্রিণ্টার্স'
৭-ডি, হেরম্ব দাস লেন,
কলিকাতা-৯।

প্রচ্ছদ :
শ্রীগণেশ বসু

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
রয়েল হাফটোন এণ্ড কোং
৪, সরকার বাইলেন, কলি-৬।

পাঁচ টাকা

সুসাহিত্যিক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু —

পাটনা।

দেবপুত্রের মত সুন্দর ছেলেটি।

পৌরুষের সঙ্গে ওর দেহে এক স্নিগ্ধ কমনীয়তা।

হবেই তো, কারণ বাংলার জলবায়ু একদিন ওর দেহকে পুষ্ট করেছে। বাংলার স্নিগ্ধতা ওর মধ্যে স্বাভাবিক।

বসে রয়েছে ছেলেটি, আর তাকে ঘিরে দু'জন গত যৌবন—প্রৌঢ়। প্রৌঢ় দুটির চোখে শৃগালের ধূর্ত্ততা।

সমস্ত মুখমণ্ডলে গৃধিনীর লোভ।

দুই ভাই ওরা। সৈয়দ ভাই নামে পরিচিত। ক্ষমতা চায়।

হিন্দুস্থানকে নিজেদের ইচ্ছা মতন নাচাতে চায়।

কিন্তু উপায় নেই ; কারণ জাহান্দার শাহ তখন সম্রাট। শক্তি আর বুদ্ধি, দুইয়েরই তার তুলনা নেই।

সুতরাং যতদিন তিনি সিংহাসনে থাকবেন, আশা নেই কোন। তার মৃত্যুর পরও আশা নেই, যদি না নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে কোন বাদশা পুত্রকে পাওয়া যায়।

সেই সন্ধান চলছে তাদের।

এই অপূর্ব্ব সুন্দর যুবক তাদের শিকার।

ফর্‌রুক্‌ সিয়র।

মোগল বাদশার শোণিত তার ধমনীতে।

পিতা আজিম উশ্‌শান একদিন বাংলার সুবাদার ছিলেন। সাম্রাজ্যের স্বপ্ন তারও দু'চোখে।

চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে সেই যুবকের। আর শিকার হাতের মুঠোর মধ্যে আসছে দেখে পৈশাচিক এক দীপ্তি ফুটে উঠেছে সৈয়দ ভাই দুজনের চোখে মুখে।

কথা বললেন ধীরে ধীরে ফর্‌রুক্‌ সিয়র, কিন্তু কি করে তা' সম্ভব ?

উত্তর দিলেন আবদুল্লা, অসম্ভব দুনিয়ার কিছুই নেই খোদাবন্দ। আপনি শুধু রাজি হয়ে যান, দেখবেন সব সম্ভব হয়ে যাবে। বান্দাদের উপর নির্ভর করুন, দেখবেন দিল্লীর তক্তে তাউস আপনার।

একটু কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠল ফর্‌রুক্‌ সিয়রের মুখে, বললেন, কিন্তু জাহান্দার শাহ জীবিত থাকতে তা কি করে সম্ভব ? তিনিই বা হেলায় দিল্লীর সিংহাসন হারাবেন কেন ?

—হেলায় কেন, অক্ষমতার জন্য হারাবেন। আমরা ছিনিয়ে নেব।

শাহজাদা বললেন, কিন্তু আমিই যে খতম হব না একথাটা বুঝলেন কি করে ?

মনের ইচ্ছাটা গোপন রেখে হুসেন বললেন, খোদাবন্দ, মানুষকে দেখেই তার অনেকটা বলে দেওয়া যায়। আপনার চলা, বলা, দেখা সব বাদশাহী ঢংয়ে। ছোট বেলা থেকে আপনাকে দেখে আসছি। আর তা ছাড়া আপনি আজিম উশ্‌শানের পুত্র। আমরা তো গত শাহজাদাকে ভাল করে চিনতুম। আলমগীরের পরে তার মত যোগ্য কেউ ছিলেন না। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাও বাদশার মতনই ছিল। তাঁর ছেলে আপনি, আপনার মর্জ্জি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। আর তাছাড়া ভাবুন কেমন নৃশংস ভাবে জাহান্দার তাঁকে হত্যা করেছেন।

হিন্দুস্থানের তক্তে বসবার আকাঙ্ক্ষা ফর্‌রুকের যে ছিল না তা নয়। কিন্তু চেপেই রাখতে হয়েছিল তাকে। জাহান্দার শাহের জীবিতকালীন কিছু করবার উপায় ছিল না। অবশ্য পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার দুর্দ্দান্ত আকাঙ্ক্ষাও তার ছিল। কিন্তু সেই অবদমিত আকাঙ্ক্ষা আবার যেন পথ কেটে বের হতে চাইল। শাহজাদা বললেন, দেখুন কি করতে পারেন। তবে সাবধানে। জানাজানি হলে আমারও বিপদ, আপনারও। সকলেরই গর্দ্দান যাবে।

আবদুল্লা আশ্বাস দিয়ে বললেন, কোন ভয় নেই শাহাজাদা।

জাহান্দার শাহ এখন রাজপুতানায় আছেন। মেবার, অম্বর আর মাড়বার একত্র হয়েছে সম্রাটের বিরুদ্ধে। এই সুযোগে···

চমকে উঠলেন ফররুক সিয়র, সে কি! গৃহযুদ্ধের সূচনা করতে চান?

একটু মোলায়েম হাসি হেসে হুসেন খাঁ বললেন, গৃহযুদ্ধটা বাদশাদের কাছে নতুন কিছু নয়। আকবর থেকে আরম্ভ করে আলমগীর সবাই সিংহাসনের জন্য গৃহযুদ্ধ করেছেন। তক্তে তাউসের পথ রক্তে ভেজা। ওখানে উঠতে হলে রক্ত একটু মাড়াতে হবে বৈকি খোদাবন্দ।

রক্তকে ভয় পান না ফররুক্ সিয়রও।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যুদ্ধ করতে হলে শক্তি সামর্থ্যের যে প্রয়োজন, তা তার কৈ?

ফররুক্ সিয়রকে নীরব দেখে আবদুল্লা বললেন, ভয় করবেন না শাহজাদা. হয়তো শেষ পর্য্যন্ত গৃহযুদ্ধ করতে হবে না. সিংহাসন ভাগ্যে জুটে যেতে পারে।

কেমন একটু সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন ফররুক্ সিয়র।

আবদুল্লা বললেন, অল্পদিনের মধ্যেই জানতে পারবেন। আর তা যদি সম্ভব না হয়, মারাঠারা আমাদের হাতে আছে। তাদের দিয়ে কাজ হাসিল হবে।

অপর পক্ষে রাজপুতরাও চিরদিন মিলে মিশে থাকতে পারবেন না। সেটা কখনো সম্ভব নয়। মোগল বাদশা গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন, কিন্তু রাজপুতরা মারামারি কাটাকাটি থামাতে পারবে না।

আপনি শুধু রাজি হোন।

একটা আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে আবদুল্লা তাকালেন শাহজাদার দিকে।

ফররুক্ সিয়রের যৌবনের রক্ত তখনি ফুটতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু নিতান্ত আগ্রহ দেখান উচিত নয় ভেবেই তিনি ধীরে ধীরে বলবার প্রয়াস পেলেন, দেখুন কি হয়। সবই খোদার মর্জ্জি। আপনাদের মেহেরবাণীও। হিন্দুস্থানের দায়িত্ব যদি আমার নেওয়া

উচিত হয়, নিশ্চয় আমি সে দায়িত্ব গ্রহণ করব।

তার হাবভাবের মধ্যে চাপা আবেগ স্পষ্টই ফুটে বেরুল। ওষুধ ধরেছে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়। তারা কুর্নিশ করে সম্মান জানালেন ফররুক্ সিয়রকে।

হুসেন বললেন, হিন্দুস্থানের দায়িত্ব যদি নিতে রাজি থাকেন তবে জানবেন হিন্দুস্থান আপনারই। আপনি শুধু আমাদের তু'জনের উপর বিশ্বাস রাখুন। জানবেন, এ বান্দারা আপনার মঙ্গল বই অমঙ্গল কামনা করবে না কখনো।

'আল্লাহ আকবর।' বলে ফররুক্ সিয়র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন,—সবই খোদাতাল্লার মর্জ্জি, আমি আপনাদের কথার অবাধ্য হব না। আমি তক্তে তাউস পেলে আপনাদের পরামর্শেই তা পরিচালিত হবে।

আবার নত হয়ে কুর্নিশ জানালেন তুজনেই, তারপর উঠে দাঁড়ালেন,—তাহলে আসছি খোদাবন্দ, তক্তে তাউসের সামনেই আবার আমাদের দেখা হবে।

ওরা তু'জন চলে গেলেন দৃষ্টির আড়ালে।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবতে লাগলেন ফররুক্‌সিয়র। কেমন একটা অস্থির ভাব যেন নিজের মধ্যে অনুভব করলেন তিনি। নিজেকে যেন আর নিজের মধ্যে ধরে রাখা যায় না এই মুহূর্ত্তে। আনন্দের শিহরণ বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে দেখবার ইচ্ছে হল তার। কিন্তু কে আছে এই মুহূর্ত্তে অত্যন্ত আপনজন যার কাছে হৃদয়ের গোপন কথাও খুলে বলা যায়?

ফারুক উন্নিসার নাম মনে পড়ল তার।

ফররুক্ সিয়রের প্রিয়তমা পত্নী।

জাহাঙ্গীর যেমন নূরজাহানকে, শাহজাহান যেমন মমতাজকে ভালবাসতেন, তেমনি ফারুক উন্নিসাকে ভালবাসেন শাহজাদা।

ধীরে ধীরে হারেমের দিকে চলে এলেন তিনি।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছিল রাত্রে।

এখন প্রথম প্রহরের অন্ধকার পার হয়ে প্রতিপদের চন্দ্র উঠেছে। ম্লান জ্যোৎস্নায় কিসের বিষণ্ণ সৌন্দর্য্য।

ফর্‌রুক্‌ সিয়র ধীরে ধীরে ফারুকউন্নিসার মহলে উপস্থিত হলেন।

ফারুকউন্নিসা ঠিক সেই সময় পাটনার প্রাসাদের উপর ম্লান জ্যোৎস্নার খেলা দেখছিলেন হয়তো।

ঔরংজীবের পর মোগল সাম্রাজ্যের উপরও এমন একটা ম্লান আভা নেমে এসেছে।

চতুর্দ্দিকে তাকালে বেদনার কেমন যেন ইঙ্গিত ফুটে উঠে। সেই চাঁদের আলোতে নিজের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করে কি ভাবছিলেন ফারুকউন্নিসা। হঠাৎ পেছনে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে তাকালেন, একি! শাহজাদা!

অনেকদিন পরে যেন ফর্‌রুক্‌ সিয়র আজ একটু হাসলেন। তার বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, জীবনের একটা স্পন্দন নিয়ে মৃদু জ্যোৎস্নার বিমর্ষ পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে জ্বলতে লাগল যেন। অনেক দিন পরে এই হাসি ভাল লাগলেও, কেমন একটা সন্দেহ হ'ল ফারুকউন্নিসার।

শাহজাদার দিকে তাকিয়ে বলল, আজ শাহজাদাকে নতুন মনে হচ্ছে?

পরিহাস করলেন ফর্‌রুক্‌সিয়রও, আমি কি পুরানো হয়ে গেছি তোমার কাছে?

মুসলিম সংস্কৃতির যোগ্য উত্তরাধিকারিণী ফারুকউন্নিসা, ফেরদৌসি থেকে হাফিজ সব পাঠ করেছেন তিনি। কথা বলতে জানেন। কথার উত্তরও দিতে জানেন। বললেন,—পুরানো হবার কোন প্রশ্ন আসে না, কারণ আপনি আমার দয়িত। প্রেম চিরদিন নূতন। সুতরাং প্রেমিক পুরানো হতে পারে না।

প্রেমের একটা আবেশ ফুটে উঠল ফর্‌রুক্‌সিয়রের চোখে। এগিয়ে এসে ফারুকউন্নিসাকে তিনি বুকের কাছে টেনে নিলেন। বললেন, সত্যি আজ আমার বড় ভাল লাগছে ফারুকউন্নিসা।

—কেন?

—ভবিষ্যতের এক রঙিন স্বপ্ন দেখে।

—কিসের রঙিন স্বপ্ন শাহজাদা?

—দিল্লীর তক্তে তাউস।

তক্তে তাউসের নাম শুনে একটু যেন চমকে উঠল ফারুকউন্নিসা। ওখানে লোভ আছে, ক্ষমতা আছে, কিন্তু প্রেম নেই। ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভিশাপ, কান্না, রক্ত।

ভাবতেই যেন দেহটা কেঁপে উঠল ফারুকউন্নিসার।

—না, না শাহজাদা, কাজ নেই। তক্তে তাউস বড় অভিশপ্ত। ওখানে বসায় গৌরব থাকতে পারে, শান্তি নেই জীবনে আমাদের যেটুকু শান্তি আছে, প্রেমের যে নিবিড় উপভোগ আছে তা আর থাকবে না। তখন জীবন হবে এক নতুন পরিবেশে। ওর সিংহাসনের তলায় ষড়যন্ত্র, বন্ধুর বেশে পার্শ্বে শত্রু, বাঁচবার জন্য শুধু সংগ্রাম অবিশ্বাস, শঠতা, নিষ্ঠুরতাই আজ দিল্লীর মসনদের দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও সিংহাসনের দিকে লোভের দৃষ্টি দেবেন না শাহজাদা। আমাদের সুখের নীড় ভেঙ্গে যাবে। হয়তো—

একটা অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু করে ফারুকউন্নিসার বুকটা কেঁপে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নার বিষণ্ণধারা বেয়ে তার চোখের সামনে কাদের বেদনার্ত্ত কতগুলি মূর্ত্তি যেন এসে হাজির হয়।

স্পষ্ট যেন সে দেখতে পায়, দারা মুরাদ, সুজা, তার শ্বশুর আজিম উশ্‌শান আরো বহু

যেন একটা চিৎকারেই ফেটে পড়তে চায় ফারুকউন্নিসা, না না শাহজাদা দিল্লীর মসনদের স্বপ্ন দেখবেন না। ও বড় পাপের স্থান।

এই ভাল আছি।

ফররুকসিয়র ভালবাসেন ফারুকউন্নিসাকে। খুবই ভালবাসেন। কিন্তু তাই বলে প্রেমের মধ্যে দুর্ব্বলতার যে উপস্থিতি, ফররুক সিয়রের কাছে তার স্বীকৃতি নেই।

দুর্দ্ধর্ষ তৈমুর আর চেঙ্গিস খাঁর রক্ত বইছে তাঁর মধ্যে।

মোগলদের সিংহাসন একটা বিলাস।

হারেমের রমণীর মত সিংহাসনেরও একটা মায়াবী হাতছানি আছে তাদের কাছে।

সিংহাসনভ্রষ্ট মোগল শাহজাদার যেন বাস্তব কোন উপস্থিতিই নেই। মোগল বংশে জন্ম গ্রহণ করবার চরম সার্থকতা হ'ল দিল্লীর সিংহাসন। ফররুকসিয়রও সে মোহের উর্দ্ধে উঠতে পারেননি, পারবেনও না কোনদিন। তাঁর রক্তের মধ্যে আছে দুর্দ্ধর্ষ তুর্কী রক্ত। সিংহাসন তার ধ্যান, সিংহাসন তার জ্ঞান।

ফারুকউন্নিসার ভয় দেখে একটু হাসলেন শাহজাদা। বললেন, মোগল বাদশাহের গদিই যে আমাদের চরম সার্থকতা। সে স্বপ্ন বাদ দিয়ে কি করব ফারুকউন্নিসা! নিজেকে তক্তে তাউস ভিন্ন কল্পনাই করতে পারি না আমি।

সাবধান করে দেবার জন্যই বুঝি বলল ফারুকউন্নিসা, কিন্তু তার পরিণামটাও ভেবে দেখবেন শাহজাদা। ঐ সিংহাসনের জন্য দারাকে উপহার দিতে হয়েছিল শির, মুরাদকে বলি দিতে হয়েছিল তার জীবন, আর সুজাকে হিন্দুস্থান ত্যাগ করতে হয়েছিল। আর শুধু তাই নয়, সিংহাসন পাওয়াতেও কোন লাভ নেই। গদি পেয়েই কি আলমগীর সন্তুষ্ট হতে পেরেছিলেন? বরং তিনি তাঁর জীবনের শান্তি হারিয়েছিলেন রাজদণ্ড গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে। মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের ভুল স্বীকার করে গেছেন তিনি।

ফররুকসিয়র বললেন, হয়তো পেরেছিলেন, কিন্তু তবু কি জান ফারুক, বংশের একটা ধারা আছে। রক্তের একটা দাবী আছে।

বুঝেও আমরা সব বুঝতে চাই না। যদি আলমগীর নিজের ভুল সিংহাসনে বসবার আগেও বুঝতেন, তবু তিনি তার আহ্বান কোন মতেই এড়াতে পারতেন না—কিছুতেই না। দিল্লীর তক্তে তাউসের এক বিরাট আকর্ষণ আছে মোগল রাজপুত্রদের কাছে। তা যদি না হত, দারা নির্ভীক ভাবে মরতে পারতেন না। মুরাদ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সিংহাসনের আশা ত্যাগ করেন নি। সুজা যদি ঔরংজীবের বশ্যতা স্বীকার করতেন, তবে কি দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হ'ত তাঁকে? না। তবু তিনি কেন স্বীকার করলেন না ঔরংজীবের বশ্যতা? কিসের মোহে? কারণ সিংহাসনের প্রবল মায়া আমাদের পক্ষে এড়ান অসম্ভব। বুঝেও আমরা বুঝতে পারি না ফারুক।

একটা বিষণ্ণ বেদনায় ফারুকউন্নিসা শুধু শাহজাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন এর উপর কিছু বলবার থাকলেও বলবার নেই। ফর্‌রুক্‌সিয়র তার সেই অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন, ব্যথা পেও না। মোগল হারেমের জেনানা হতে গেলে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে। যুদ্ধের জন্য, ষড়যন্ত্রের জন্য, রক্তের জন্য, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতেই হবে। লালকেল্লার মধ্যে এটাই আমাদের অভিনব উপভোগ্য জীবন।

কি যেন ভাবল ফারুকউন্নিসা। তার সেই চিন্তারত অবস্থার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ফর্‌রুক্‌সিয়র কিছুকাল।

কিন্তু কি যেন তার দেহের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলছিল। অপ্রতুল জ্যোৎনার মধ্যেও কী একটা মাদকতা ছিল।

এই মুহূর্তে নীরব সান্নিধ্যে নয়, কথার মধ্যে জীবনের আবেগকে ফুটিয়ে উপভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগছিল ফর্‌রুক্‌সিয়রের। ধীরে ধীরে তাই তিনি ডাকলেন, উন্নিসা।

মুখ তুলে তাকাল ফারুকউন্নিসা। কিন্তু ফর্‌রুক্‌সিয়রের আকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টির প্রত্যুত্তর যেন সে দৃষ্টিতে নেই। জ্যোৎস্নার

স্নিগ্ধতাই আছে; কিন্তু বসন্ত বাতাসের কোন উন্মাদনাই নেই সেখানে।

একটু হেসে তাকে চটুল করে তুলতে চাইলেন শাহজাদা। মনের মধ্যে আশঙ্কার যে অন্ধকার দানা বেঁধেছে, তাকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন, বললেন, কি হয়েছে তোমার? এত ভাবছ কি?

ওসব যেন অতি তুচ্ছ ব্যাপার—এমনি একটা ভাব দেখাতে চাইলেন ফর্‌রুক্‌সিয়র।

কিন্তু যে মেঘ ঘনীভূত হয়ে জমে উঠেছিল মনের মধ্যে, তা যেন আর সহজে উড়ে গেল না। হাসি ফুটল না ফারুক উন্নিসার মুখে। বিষণ্ণ দুটি চোখ তুলে সে তাকাল শাহজাদার দিকে। সে দুচোখে কিসের যেন প্রশ্ন।

আবার একটু হাসলেন ফর্‌রুক্‌সিয়র, বললেন, তোমার হৃদয়ের সিংহাসনের কোন অবমাননা হবে না ফারুক। যদি দিল্লীর তক্তে তাউসও পাই, তার উপর চিরদিনই আমি স্থান দেব তোমার মনের সিংহাসনের। তোমার অমর্য্যাদা কোনদিনই হবে না। তাছাড়া ভয় পেয়ে লাভ নেই। ভাগ্য প্রবল। আল্লার বিধানকে তো এড়ান যাবে না। বিপদ থেকে দূরে থাকলেও বিপদ যে মানুষের কাছে আসবে না তা বলা যায় না। সুতরাং বিপদকে গ্রাহ্য না করে এগিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছণীয়। এটাই পুরুষকার। তৈমুরের রক্ত আমাদের মধ্যে সেই এগিয়ে যাবার প্রেরণাই দেয় ফারুক উন্নিসা।

ভয়ে কিংবা অনুরাগে কে জানে, একটু কণ্ঠ কেঁপে গেল ফারুক উন্নিসার। সে বলল, অত বিচারের ক্ষমতা নেই আমার। আমি আর ভাবনা শাহজাদা। আপনার পথই আমার পথ। যদি আপনি এ পথে সুখী হন আমিও হব।

আরো মধুর করে তাকে কাছে টানলেন শাহজাদা। স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল একটা দৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে থাকলেন ফারুকের মুখের দিকে। মৃদু ভঙ্গিতে কোমল দুটো চোখ মেলে ফারুক উন্নিসা

শাহজাদার দিকে তাকিয়ে থেকে, সমস্ত দেহের মধ্যে কিসের এক আবেগ অনুভব করতে থাকল।

আবার হাসলেন ফর্‌রুক্‌ সিয়র, কি, কিছু বলবে আমাকে ?

ফর্‌রুক্‌ উন্নিসা বলল, গোস্তাকি মাপ করবেন। একটা প্রশ্ন করছি। সত্যি কি আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসতে চান ?

—কেন বল তো ?

—কারণ আছে। জাহান্দার শা এখনো জীবিত। আপনি কি করে দিল্লীর সিংহাসন আশা করতে পারেন ?

—ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় তবে তা' সম্ভব নয় কি ?

—গৃহযুদ্ধ ছাড়া তা সম্ভব নয়।

—হয়তো তাই। মোগল সিংহাসনের জন্য ভাতৃকলহ, জ্ঞাতি কলহ তো কম হয়নি। হবে না এ আশাই বা করছ কেন ?

—কিন্তু আপনার পক্ষে দাঁড়াবে কে ?

আবার একটু হাসলেন ফর্‌রুক্‌সিয়র, ও বুঝেছি, তোমার এত ভাবনা কেন। ভয় পেও না, দাঁড়াবার লোকের অভাব হবে না। মনে রেখ, আমি দাঁড়াইনি, আমাকেও দাঁড় করান হচ্ছে। প্রতিপত্তি-শালী আবদুল্লা আর হুসেন খাঁ জাহান্দার শাহের উপর অসন্তুষ্ট। তাঁরা দিল্লীর মসনদ তাই অজিমউশ্‌শানের পুত্রকে দিতে চাইছেন। ওদের সমর্থন পেলে দিল্লীর সিংহাসনে বসা তেমন কঠিন কাজ নয়।

প্রত্যুত্তরে একটু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল ফার্‌রুকউন্নিসা। মনে হল দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি লোভ তার নেই। আছে শুধু ভয়। কিন্তু সেই ভয়কে এই নতুন সন্ধ্যায় কিছুতেই ফারুক উন্নিসার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতে দিতে প্রস্তুত নন শাহজাদা। তাই তিনি আরো কাছে এগিয়ে এলেন তার।

দুটো সবল বাহু দিয়ে তিনি ফারুককে বুকের কাছে টেনে আনলেন। যেন সেই বুকের সান্নিধ্যে তাকে পরম আশ্রয় দিতে চান তিনি। সেই আকর্ষণের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে

দিল ফারুক উন্নিসা। সেই মুহূর্তে তার সমস্ত মুখমণ্ডলে কিসের একটা দ্যুতি ফুটে উঠল। তা' পরম নির্ভরতা আর প্রশান্তিতে সুন্দর। সেই সুন্দর মখখানি নিজের করতলে রেখে শাহজাদা ঊর্দ্ধে তুলে ধরলেন। তারপর তার উজ্জ্বল দুটি পৌরুষব্যঞ্জক চোখে ফারুক উন্নিসার চোখের দিকে তাকালেন।

সেই দৃষ্টির দিকে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকালো ফারুক উন্নিসাও। সাপুড়ের মত সেই দুটো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে শাহজাদা মুগ্ধ ভুজঙ্গের মত অভিভূত করে ফেললেন তাকে। ধীরে ধীরে বললেন তিনি, ভয় কি ফারুক উন্নিসা। আমি তো আছি।

—তাইতো ভয়। বাদশা হলে কি এমনিভাবে আপনাকে পাব?

—কেন?

—তখন কত কাজ। কত ব্যস্ততা। জীবনকে তো নির্ব্বিবাদে উপভোগ করবার সময় নেই সেখানে। কি হবে ঐ সিংহাসনে। তার চেয়ে বড় সিংহাসন আমার হৃদয়। আপনি সেখানেই একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে থাকুন শাহজাদা।

দুই

লাল কেল্লা।

হিন্দুস্থানের বুকে মোগল বাদশার উদ্ধত নিশান।

ওর প্রতি প্রস্তরে যেমন রয়েছে মানুষের রক্ত, তেমনি সমস্ত পরিবেশ জুড়ে রয়েছে ব্যাভিচারের উপস্থিতি।

নর্ত্তকী মহল।

লাল কুমারীর নামে নতুন নাম রেখেছেন তার জাহান্দার শাহ।

সাজিয়েছেন রত্ন মানিক্যে। সাজিয়েছেন মূল্যবান পাথরে।

ইউরোপ থেকে দর্পণ আমদানী করেছেন জাহান্দার শাহ। স্ফটিকের মত নীরব ঔজ্জ্বল্যে চক্‌চক্‌ করছে দেয়ালে দেয়ালে।

আর্শি মহল।

এখানে দাঁড়ালে হাজার হাজার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠে একটি মুখের।

সেই মহলে আজ অজস্র প্রতিবিম্বের সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে দাঁড়িয়েছে একটি রমণী।

লাল কুমারী! বাদশাহের পেয়ারের নর্ত্তকী।

দেয়ালের চতুর্দ্দিকে যেন জীবন্ত ফুল ফুটে উঠেছে।

ফুল নয়, ফুলের চেয়েও সুন্দর একটি মুখ। লাল কুঁমারীর মুখ।

আফগানিস্থানের সুর্মা দিয়ে আঁকা তার চোখ। আয়ত, বিস্তারিত।

হিন্দুস্থানের শ্রাবণের মেঘের মত গাঢ় কেশ।

গোলাপি আভার মোমের মত মোলায়েম দেহ। আর পারস্যের গোলাপের মত রক্তবর্ণ দুটি অধর।

সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর লাল কুমারী।

দেখছে, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে সে নিজেরই অবয়ব।

বার বার দেখেও যেন নিজেরই আর তৃপ্তি হচ্ছে না।

কিসের জন্য তার এই প্রসাধন? কিসের জন্য তার এই রূপ চর্চ্চা?

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রতিবিম্বে ফুটে উঠল আর একটি মুখ।

ক্লান্ত, ম্রিয়মান, অথচ গম্ভীর। দুটো চোখ অত্যন্ত কোমল, মধুর।

জাহান্দার শাহ্‌ মোগল বাদশা, হিন্দুস্থানের ভাগ্য বিধাতা।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে বাদশা তাকিয়ে থাকলেন সেই প্রতিবিম্বিত সৌন্দর্য্যের দিকে। আর সেই প্রতিবিম্বের মধ্যেই লাল কুমারীর সঙ্গে চোখে চোখ মিলে গেল তার।

বাদশা তাকিয়ে দেখলেন, আর শুধু দেখতে লাগলেন তাকে।

এইবার সেই সৌন্দর্য দেবীর রক্ত ওষ্ঠের প্রান্তে রৌদ্রের মত একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল।

পিকধ্বনি উঠল যেন, সেই বিচ্ছুরিত ওষ্ঠাধর থেকে, কি দেখছেন বাদশা ?

শিল্পীর মত আবেগময় কণ্ঠে উত্তর দিলেন বাদশা, দেখছি খোদা তালার সৃষ্টিকে। ভাবছি তাঁর অসীম ক্ষমতাকে। কি শক্তি, কি শিল্পবোধ থাকলে এ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায়। এ সৃষ্টি মহান আল্লারই সম্ভব। ভাবছি তুমি মর্তে এলে কি করে।

—কেন ?

মধুর করে হেসে তার দিকে ফিরে তাকালো লাল কুমারী, বললেন, আপনারই জন্য খোদাবন্দ !

—আমার জন্য ? তবে আমি ধন্য লাল কুমারী। হয়তো আমাকে সুখী করবার জন্য খোদা বেহেস্তকে বঞ্চিত করেছেন।

—কেন ?

—বেহেস্তের স্বর্গীয় উদ্যানের জন্যই তো হুরীর সৃষ্টি। মর্তের জন্য তো নয়। তুমি সেই বেহেস্তের সর্বশ্রেষ্ঠ হুরী। তুমি স্বর্গ ভ্রষ্ট।

হাসল একটু লালকুমারী, রামধনুর একটা ছটা যেন ছিটকে এল তার সে হাসি থেকে। বলল, স্বর্গভ্রষ্ট যদি আমি হয়ে থাকি, সেই আমার সুখ খোদাবন্দ। কারণ স্বর্গভ্রষ্ট না হলে তো আমি আপনাকে পেতাম না।

একটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বাদশা লাল কুমারীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

লাল কুমারী হঠাৎ কি মনে করে কে জানে, প্রশ্ন করল বাদশাকে,

—স্বর্গ কি খোদাবন্দ ?

ঊর্দ্ধে: নীল আকাশ দেখিয়ে বললেন বাদশা, ঐদিকে বেহেস্ত। খোদাতালা থাকেন ওখানে।

—না।

প্রতিবাদ করল লাল কুমারী।

চমকে উঠলেন বাদশা। কেমন একটা অবাক দৃষ্টি মেলে তাকালেন তিনি তার দিকে।

হেসে বলল লাল কুমারী, হ্যাঁ, উর্দ্ধে স্বর্গ নেই। বেহেস্ত এই তুনিয়াতেই রয়েছে মেহেরবান। প্রেমই স্বর্গ। যে ভালবাসতে জানে সেই স্বর্গ লাভ করে। যে ভালবাসা পায় সেই স্বর্গে বাস করে।

বাদশা নির্বাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছিলেন।

লালকুমারী একটু থেমে বলতে লাগল, অপ্রেমই অসুখ। অপ্রেমই দোজক। খোদাবন্দ নিশ্চয়ই ওমরের কথা মনে করতে পারেন? ওমর কি একথা বলেন নি?

কথা বললেন না বাদশা। মনে হ'ল তাঁর—এর জবাব কথায় দেওয়া যায় না।

তাই তিনি আরো একটু এগিয়ে এলেন। সবল তুটি বাহু বাড়িয়ে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করলেন লাল কুমারীকে নিজের কাছে।

বাদশার দেহে সম্পূর্ণ নিজের দেহের ভর রাখল লাল কুমারী।

কিছুক্ষণ কোন কথা হ'ল না আর। নীরব চতুর্দ্দিক।

আবার সেই নিস্তব্ধ মুহূর্ত্তকে তরঙ্গের মত কম্পিত করে দিয়ে কথা বলল লাল কুমারী।

—বাদশা কি বিশ্বাস করেন না আমার কথা?

গভীর ভাবে লাল কুমারীর চোখে তার তুটি চোখ রাখলেন বাদশা। ধীরে ধীরে বললেন, করি।

—করেন?

—নিশ্চয়ই। হাজারো বার। তোমার চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি। এত বেশী করি যে তুমিও তার মূল্য দিতে পারনি।

কেমন আশ্চর্য্য হ'ল লাল কুমারী, কেন বাদশা?

—তুমি প্রেমের মূল্য বোঝনি।

তাকাল লাল কুমারী বাদশার দিকে। তার তু'চোখে যেন তীব্র অভিমান ফুটে উঠল।

একটু মৃদু হাসলেন জাহান্দার শাহ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করে তুমি তুমি প্রেমের অমর্য্যাদা করেছ।

জাহান্দার শাহ ধর্ম্মভীরু লোক। ঔরংজীবের মত গোঁড়া মুসলমান।

একটু যেন ভয় পেল লাল কুমারী। রাগ করলেন কি তবে বাদশা ?

জিজ্ঞেস করল, কেন খোদাবন্দ। আমি কি অন্যায় করেছি প্রেমকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করে ?

—নিশ্চয়ই।

কথা বলতে পারল না আর লাল কুমারী। ভয় পেল সে।

বাদশা বললেন, প্রেমের সঙ্গে স্বর্গের তুলনা করা অন্যায়। এ দুটোর কোন তুলনাই হয় না।

কি বলতে চান বাদশা ?···অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল লাল কুমারী !

—প্রেম স্বর্গের চেয়েও বড়।

—ও··· ! বুকে যেন মেঘ জমে উঠছিল লাল কুমারীর। সেই মুহূর্ত্তে ঝড়ের হাওয়ার মত সব যেন উড়ে গেল তার। ঝাঁপিয়ে পড়ল লাল কুমারী বাদশার বুকে। তীব্র ভাবে তার দেহের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে চাইল লাল কুমারী।

বাদশা একটা সস্নেহ স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন লাল কুমারীর দেহে।

মাথা তুলে তাকাল লাল কুমারী। তার দুচোখে জল।

—একি ! অবাক হলেন বাদশা, তুমি কাঁদছ !

—না, বাদশা, এ আমার আনন্দের অশ্রু। আপনি আমাকে এত ভালবাসেন ?

বাদশা বললেন, হ্যাঁ। তোমাকে আমি ভালবাসি। আমার নিজের চেয়েও তোমাকে আমি ভালবাসি লাল। জাহান্দার শাহের গৌরব লাল কুমারী।

লাল কুমারী কৃতজ্ঞতায় যেন একেবারে নুয়ে পড়ল।

প্রেমের সে এক পবিত্র দৃশ্য !

নীরব সাক্ষী হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকল দেয়ালের আর্শিগুলো।

সেই মুহূর্ত্তে বাঁদী এসে দাঁড়াল সেখানে।

'কম্‌বক্ত' বলে গর্জে উঠতে গেলেন জাহান্দার শাহ।

বাদশার সেই দৃষ্টির সামনে যেন মাটিতে সেধিয়ে গেল যেন বাঁদী।

কিন্তু বাদশাহকে শান্ত করল লালকুমারী, মেহেরবান, খোদাবন্দ, ও আমার সামান্য বাঁদী। যদি অন্যায় করে থাকে ক্ষমা করুন।

নরম হয়ে এলেন বাদশা।

বাঁদী ভয়ে পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে।

লাল কুমারী এগিয়ে এল তার কাছে, কিরে, কি খবর ?

যেন প্রাণ ফিরে পেল বাঁদী। স্তব্ধ জীবনে স্পন্দন ফিরে এল তার। এবার ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল সে।

অভয় দেবার ভঙ্গি করে বলল লালকুমারী, কি বলবি বল ? কোন ভয় নেই।

এবার অতি কষ্টে বললে সে, বাদশার সঙ্গে দেখা করতে চান কয়েকজন ওমরাহ।

—কি করে জানল ওরা, বাদশা এখন এখানে ?

—তা জানিনা মেহের বাগ।

একটা ভীতিবিহ্বল ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বাঁদী।

কি একটু ভাবল লাল কুমারী। বাঁদীকে বলল, একটু দাঁড়া তুই বাইরে, আমি এখনি জানছি।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন সে। একটা ধৃত পাখীর মত এতক্ষণ ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করে কাঁপছিল তার। দ্রুত ছুটে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

লালকুমারী ফিরে এল বাদশার কাছে।

জাহান্দার শাহ বললেন, কি চায় ও ?

লালকুমারী বলল, ও নয় জাঁহাপনা। বাইরে ওম্‌রাহরা ভীড় করেছেন দেওয়ানী আমে। আপনাকে তাদের প্রয়োজন।
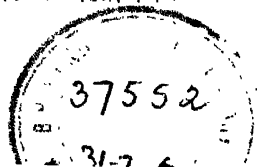
একটু ভ্রুকুঞ্চিত করে কি ভাবলেন বাদশা।

খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থাকলো লালকুমারী।

বাদশা কোন কথা বললেন না।

অবশেষে লালকুমারীই বলল,—কি প্রয়োজন সম্রাট ?

একটু হাসলেন সম্রাট। হয়তো ম্লান ছিল সে হাসি। বললেন, প্রয়োজন ওদের অনেক। কারণ ওদের রয়েছে অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা। যতদিন আকাঙ্ক্ষার শেষ না হবে, ততদিন প্রয়োজন ওদের ফুরাবে না।

কিন্তু বাদশার সে হাসিতে শঙ্কা দূর হল না লালকুমারীর। বলল,—কোথাও কি কোন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে ?

উত্তর দিলেন তক্ষুনি সম্রাট, বিদ্রোহ কোথায় নেই বল। বাইরে, অভ্যন্তরে, সর্বত্রই আজ বিদ্রোহ।

আরো যেন ভয় ফুটে উঠল লালকুমারীর চোখে।

—আপনার যদি দরবারে কোন প্রয়োজন থাকে তবে যান সম্রাট।

—না, দৃঢ়ভাবে বলে উঠলেন বাদশা !

হঠাৎ তার এই দৃঢ়তা দেখে যেন একটু আশ্চর্য্যই হল লালকুমারী।

একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে বাদশার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

বাদশা বললেন, এ অন্যায়।

কিছু বুঝতে না পেরে লালকুমারী বলল, কি অন্যায় খোদাবন্দ ?

—ওমরাহদের হঠাৎ দেওয়ানী আমে মেলা !

—কেন ?

—ওরা আমার আদেশ না নিয়ে এ কাজ করেছে।

—হয়তো কোন নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিছু বলতে যাচ্ছিল লালকুমারী, কিন্তু বাদশা তাকে শেষ করতে দিলেন না। যেন একটা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, না। হঠাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্য এমন হয়নি। আমি এর মধ্যে ঔদ্ধত্যের ইঙ্গিত পাচ্ছি। আবদুল্লা আর হুসেন খান, সৈয়দ ভাইদের কাজ এটা। ওরা চায়

দিল্লীর বাদশার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে। তাই ওম্‌রাহদের দিয়ে—কিন্তু জানে না, যে, জাহান্দার শা'র ধমনীতে রয়েছে মোগল রক্ত। কোন ওম্‌রাহকে সে,—

কথা শেষ করলেন না বাদশা। লালকুমারীকে বললেন, বাঁদী চলে গেছে ?

—না, খোদাবন্দ, বলুন তাকে কি বলব !

আবার একটু গম্ভীর হয়ে ভাবলেন জাহান্দার শা'। তারপর বললেন,—ওকে জানিয়ে দাও, ওম্‌রাহদের জানিয়ে দিক, হিন্দুস্থানের দায়িত্ব বাদশা জাহান্দার শার। দায়িত্বজ্ঞান তার আছে। প্রয়োজন সময়ে তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। তার জন্য বাদশার অনুমতি ভিন্ন ওম্‌রাহদের মিলিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। নিজের বাহুবলেই বাদশা দিল্লীর তক্তে তাউস অধিকার করেছেন। নিজের তরবারী দিয়েই তা' রক্ষা করবেন। ওম্‌রাহদের তা' নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

লালকুমারী কিছুক্ষণ বাদশার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার ভাব দেখে মনে হ'ল বাঁদীকে দিয়ে একথা বলান সমীচিন হবে কিনা, সে যেন ভেবে উঠতে পারছে না।

কিন্তু বাদশা সে কথা বলেই কি ভাবতে লাগলেন আবার, বাঁদীকে জানাবার জন্যই এগুল সে।

বাদশা ডাকলেন দাঁড়াও।

লালকুমারী ফিরে দাঁড়াল,—আপনি বরং নিজেই যান খোদাবন্দ।

কি এক আশঙ্কা যেন তার বুকের মধ্যে টিপ্‌ টিপ্‌ করছিল। যদি কোন বিপদ ঘটেই থাকে !

কিন্তু বাদশা ভাবছিলেন অন্য কথা, নিজে যাবার চিন্তা তিনি মনেও আনেন নি। বললেন,—দাঁড়াও আমি লিখে দিচ্ছি।

নর্তকী মহলের অপর প্রান্তে চলে গেলেন তিনি। কি যেন লিখলেন সেখানে। ফিরে এসে লালকুমারীকে বললেন, বাঁদীকে ডাক।

—দরজার পাশে পর্দার আড়ালেই ছিল সে। হাত ইসারা করতেই কুর্নীস জানিয়ে বাঁদী এসে হাজির হ'ল।

বাদশা সেই লিখিত আদেশ পত্রটি দিলেন তার হাতে। বললেন, দরবারে পৌঁছে দিও আর কিছু করতে হবে না। আর এই পত্র পাওয়া মাত্র ওরা চলে গেল কিনা, সে খবর আমাকে এসে দেবে—যাও।

বাদশা আবার তাঁর মুখে হাসি ফিরিয়ে আনলেন, আর লাল-কুমারীর দিকে তাকালেন।

—আমার বড় ভয় করছে, বলল লালকুমারী।

বাদশা তাকে অভয় দিলেন। কোন ভয় নেই। নিজের বাহুবলে হিন্দুস্থানের মসনদ পেয়েছি, নিজেই তা রক্ষা করব আমি।

তবু যেন ভয় গেল বলে মনে হ'ল না লালকুমারীর। মুখের মধ্যে একটা শঙ্কার ছায়া ফুটে থাকল তার।

হেসে তাকে নির্ভয় করতে চেষ্টা করলেন বাদশা, উজ্জীবিত করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, আজ কিন্তু তোমার সমস্ত কাজ ভুলে গেছ লাল?

চমক ভাঙ্গল যেন লালকুমারীর।

বাদশাকে সরাব দেবার সময় হয়েছে। রোজ এমন সময় নিজে হাতে সরাব ঢেলে দেয় বাদশাকে লালকুমারী।

কিন্তু আজকে সরাবের কথা মনে পড়তে যেন ভয় পেল সে। না, এই মুহূর্তে সরাব পান করিয়ে বাদশার চেতনাকে দুর্বল করে দেওয়া উচিৎ হবে না। তাই কিছু বলল না সে।

বাদশা-ই বললেন, ভয়ানক তৃষ্ণা পেয়েছে আমার।

পানী দেব জনাব?

—কেন? একটু হেসে তাকালেন বাদশা।

—আজ আপনি সরাব পান নাই করলেন।

—কি ভয় তোমার?

—না, আজ থাক।

—বাদশা বললেন, বেশ সরাব না হয় না দেবে, কিন্তু আর ?

আর অর্থ নাচ আর গান।

লালকুমারীর নাচ দেখা চাই রোজ। গান শোনা চাই প্রত্যহ বাদশার।

—আজ না হয় নাই নাচলাম, বলল লালকুমারী।

বাদশা বললেন, বেশ। কিন্তু গান তোমাকে শোনাতেই হবে। সমস্ত দিনের শেষে তোমার গানের জন্যই আমি উন্মুখ হয়ে থাকি লাল। তোমার গান না শুনলে জীবনের তৃষ্ণা আমার অতৃপ্ত থেকে যায়।

তবু যেন কেমন একটা উদাসীন দৃষ্টিতে লালকুমারী তাকিয়ে থাকল বাদশার দিকে।

বাদশা বললেন, কৈ, ডাক তোমার সঙ্গীদের ?

আর যেন বাধা দিতে পারল না লালকুমারী।

হাততালি দিয়ে আহ্বান করল ওধারে প্রস্তুত নর্ত্তকী আর বাদকদের।

ওরা একে একে এসে বাদশাকে কুর্নীস করে বসল যে যার আসনে।

নর্ত্তকী মহলের আশিতে হাজার হাজার নরনারীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল।

নাচও হ'ল।

প্রথম নাচল নর্ত্তকীরা।

তারপর আরম্ভ হ'ল গান।

গান গাইল একা লালকুমারী :

তার সমস্ত সৌন্দর্য্য আর লাবণ্য যেন সেই সুরের মধ্যে রূপ পেল। সুরের মূর্চ্ছনা সমস্ত পরিবেশের মধ্যে যেন একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তির সৃষ্টি করল !

শুধু অজস্র ঢেউয়ের মত স্বরগ্রামগুলো বাতাসে কাঁপতে থাকল।

জাহান্দার শা সেই সুরের কম্পনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে লাগলেন ধীরে ধীরে।

তিন

পাটনা দরবার।

উচ্চাঁকাঙ্ক্ষী ফরুকসিয়র বসেছেন ওম্রাহদের নিয়ে।

তাকে ঘিরে আছেন আবদুল্লা আর হুসেন আলি। এলাহাবাদ থেকে এসেছেন আবদুল্লা। আরো অনেক আমির আজ এসেছেন পাটনাতে শাহজাদার দরবারে।

দিল্লী থেকেও যেন কারা এসেছেন সেখানে।

তাদের জন্য আজ এই বিশেষ দরবারের প্রয়োজন।

আজিম খাঁ—বক্ত খাঁকে পাঠিয়েছেন ফরুকসিয়রের কাছে।

তার দিকে তাকালেন ফরুকসিয়র, আজিম খাঁ কি মনে করেন দিল্লী বাদশার সমূহ বিপদ?

বক্ত খাঁ বললেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই জনাব। জাহান্দার শা মোগল বংশের কলঙ্ক। মসনদে বসে তিনি মদ আর নর্তকী নিয়ে ডুবে আছেন।

আবদুল্লা বললেন, শুনেছি লালকুমারী নামে............

শুনেছেন শুধু নয়, এ অতি সত্য কথা। সম্রাট আজ লালকুমারীর রূপে উন্মাদ। সারাক্ষণ হারেমে পড়ে আছেন নর্তকীদের নিয়ে। রাজকার্যের কথা বললে তিনি অত্যন্ত রেগে যান।

সেদিন দেওয়ানী আমে ওম্রাহেরা সম্রাটকে ডেকে পাঠালে, তিনি তাদের অপমান করতে পর্য্যন্ত দ্বিধা করেননি।

অথচ রাজপুতানায় বিদ্রোহ হচ্ছে, এ সময় সেদিকে কর্ণপাত করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সম্রাট সেই প্রয়োজনের মুহূর্তে—

এভাবে বিলাসে নিমগ্ন থাকেন, তবে মোগল সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ, বিশেষ করে কাফেররা যে মুহূর্তে স্বাধীন হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই সঙ্কটের মুহূর্তে জাহান্দার শ'র ব্যবহারে সবাই উত্যক্ত।

হুসেন আলি বললেন, দিল্লীর ওম্‌রাহেরা তা হ'লে নিশ্চয়ই সবাই অসন্তুষ্ট ?

—প্রত্যেকে।

—এবার নিশ্চয়ই তারা লাহোরের যুদ্ধে আজিম উশ্‌শানের মৃত্যু ঘটানোর জন্য দুঃখিত ?

—হ্যাঁ, দুঃখিত। কিন্তু এখনতো আর উপায় নেই।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যেত, হুসেন আলি ইচ্ছে করেই আজিম উশ্‌শানের কথা উল্লেখ করেছেন। ফর্‌রুকসিয়রের মনে একটা প্রতিহিংসা জাগানোই তার উদ্দেশ্য। এবং তার কূটনীতি প্রয়োগও যে সেই মুহূর্তে নিতান্ত সার্থক হয়েছিল সেটা ফর্‌রুকসিয়রের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যেত। ক্রোধে বিবর্ণ হলেন তিনি।

হুসেন আলি এবার বক্‌ত খাঁকে বললেন, উপায় এখনো আছে। আজিম উশ্‌শান নেই বটে কিন্তু তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রয়েছেন। শাহজাদা আজিম উশ্‌শানের সমস্ত গুণাবলী রয়েছে তার পুত্রের মধ্যে।

দিল্লী যদি আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে তবে আমরাও দিল্লীর মসনদে একজন যোগ্য প্রার্থীকে দিতে পারি।

বক্‌ত খাঁ বললেন, দিল্লী প্রস্তুত হয়েই আছে।

এবার বললেন আবদুল্লা খাঁ, আমরাও তবে প্রস্তুত। আমরা পূর্বেই ঠিক করে রেখেছি মোগল তক্তে তাউসে জাহান্দার শাহের মত একজন কম্‌বক্তকে বসতে দেব না।

শাহজাদাকে আমরা সে ভাবেই প্রস্তুত করে চলেছি।

শাহজাদাও প্রস্তুত।

ফর্‌রুকসিয়রের মুখের দিকে তাকালেন তিনি।

ফর্‌রুকসিয়র বললেন,—আপনারা যদি মনে করেন, তবে হিন্দুস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি রাজি। তা ছাড়া আমি কোনদিন পিতৃহন্তাকে ক্ষমা করিনি, করবও না।

পাটনাতে আমি স্বাধীন ভাবেই আছি। দিল্লী অভিযানের কল্পনা আমার বরাবরই রয়েছে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম। সৈয়দ ভাই খাঁ সাহেব আবদুল্লা আর হুসেন আলির কাছেও আমি কৃতজ্ঞ যে, তারা আজিম উশ্‌শানের কথা মনে রেখে, তাঁর পুত্রকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।

বিনয়ের ভান দেখালেন হুসেন আলি, এ আমাদের কর্তব্য শাহজাদা। আজিম উশ্‌শানের নিমক খেয়েছি আমরা। আলমগীরের নিমকও খেয়েছি। মোগল সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাক—এ আমরা সচক্ষে দেখতে পারব না। তাই···

ফর্‌রুকসিয়র বললেন, আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আর লজ্জা দিতে চাইনা। তবে একথা বলতে পারি—আজকে আপনাদের সাহায্যের কথা কোনদিন ভুলব না। আর খোদার দোয়াতে যদি দিল্লীর মসনদ আমাদের হয়, সৈয়দ ভাইদের পরামর্শ ব্যতীত আমি কিছু করব না—একথাও প্রতিজ্ঞা করছি।

আবদুল্লা আর হুসেন আলি, দু'ভাইয়ের চোখে কিসের একটা আলো ফুটে উঠল যেন সেই মুহূর্তে। দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল দু' ভাইয়ের মধ্যে।

আবদুল্লা বক্‌ত খাঁকে বললেন, আপনারা যদি মনে করেন, তবে শিগ্‌গীরই আমরা দিল্লী রওনা হব। তবে আপনাদেরও কিছু সাহায্য আমাদের প্রয়োজন হবে।

—বলুন কি সাহায্য ? বক্‌ত খাঁ বললেন।

আবদুল্লা বললেন, জাহান্দার খাঁকে এই সময় ব্যস্ত রাখতে হবে।

—কি রকম ?

—দিল্লী গিয়েই এমন কতকগুলো সমস্যার সৃষ্টি করান, যার ফলে

জাহান্দার শা যেন বিহারের দিকে আর ফিরে তাকাতে না পারেন। এবং দিল্লী থেকে একদল ওম্‌রাহদের পাটনার দিকে পাঠিয়ে দেবেন।

—তারপর ? বকৃত খাঁ তাকিয়ে থাকলেন আবহুল্লার দিকে।

আবহুল্লা বললেন,—তারপর আমরা আমাদের কাজ করব। তবে মনে রাখবেন, ওম্‌রাহ্‌দের না পাঠান পর্য্যন্ত আমরা রওনা হব না।

বুঝবার ভান করলেন বকৃত খাঁ। বললেন, বেশ, সে ভাবেই কাজ করব আমরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেন আমাদের বিপদে ফেলবেন না।

তোওবা ! কসম খেলেন আবহুল্লা। এখনো আল্লা আছেন, চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে। সৈয়দ ভাইয়েরা মিথ্যে বলেনা কখনো। আর তা ছাড়া শাহজাদা ফর্‌রুকসিয়রকে বিশ্বাস করতে পারেন আপনারা।

—না, না, সে ত ঠিক···আর কিছু বলতে পারলেন না বকৃত খাঁ।

হুসেন আলি এবার বললেন, আপনি তাহলে আর দেরী করবেন না। এই মুহূর্ত্তে দিল্লী রওনা হন, আমরাও প্রস্তুত হচ্ছি।

শাহজাদাকে কুর্নীস করে উঠে দাঁড়াল বকৃত খাঁ।

শাহজাদা শুভ কামনা করলেন তার।

বকৃত খাঁ দরবার ত্যাগ করলেন। হুসেন আলি আর আবহুল্লা উঠে গিয়ে তাকে এগিয়ে দিয়ে এলেন।

বকৃত খাঁ চলে গেলে, একটা জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন ফর্‌রুকসিয়র সৈয়দ ভাইদের দিকে।

হুসেন আলি বললেন, এইবার আমাদের নিজের কাজে এগিয়ে যেতে হবে শাহজাদা।

—বলুন কি করতে হবে ? জিজ্ঞেস করলেন শাহজাদা।

হুসেন আলি বললেন, গৃহযুদ্ধে অস্ত্রের চেয়েও বড় অর্থ। আপনাকে প্রথম অর্থ সংগ্রহে মন দিতে হবে।

—কি ভাবে ?

বাংলার দেওয়ান এখন মুর্শিদকুলি খাঁ। বাংলার প্রেরিত

অর্থই আজ দিল্লী বাদশার একমাত্র সম্বল। সেই অর্থ দিল্লীতে পাঠানো বন্ধ করতে হবে এবং আপনাকে পেতে হবে।

কিভাবে তা' সম্ভব, যেন সেটা ঠিক বুঝতে না পেরে ফরুরুকসিয়র তাকালেন হুসেন আলির দিকে।

হুসেন আলি বললেন, এই মুহূর্তে আপনি নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করে দিন। মুর্শিদকুলিকে তলব করে পাঠান অর্থ পাঠাবার জন্য।

—যদি তিনি না পাঠান?

—যাতে পাঠান তার ব্যবস্থা করব। বাংলা আক্রমণ করব আমরা। মুর্শিদকুলি খাঁর সাধ্য নেই বাংলা আক্রমণ করলে আমাদের বাধা দেন। যদি তিনি অর্থ দিয়ে বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন, কোন কথা নেই। যদি না করেন, ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে। কারণ পেছনে শত্রু রেখে দিল্লীর দিকে এগোন সম্ভব নয়।

ফরুরুকসিয়র বললেন, বেশ তাই করুন।

হুসেন আলি বললেন, তিমুর বেগকে বাংলায় পাঠিয়ে দিন, কিছু সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যাক সে। যদি মুর্শিদকুলি খাঁ বাধা দেন, তবে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

সেই মুহূর্তে তিমুর বেগকে অল্প কিছু সৈন্য দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল বাংলার দিকে।

হুসেন আলি বললেন, আর একটি কাজ করতে হবে শাহজাদা।

—বলুন।

—নিজের নামে খুত্‌বা পাঠ করতে হবে। নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করতে হবে এই মুহূর্তে।

উলেমাদের ডাকা হল।

খুত্‌বা লিখে দিলেন ওরা। সম্রাটের নামে পাঠ করা হ'ল তা'।

ফরুরুকসিয়র নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করলেন।

তরবারি কোষমুক্ত করে সৈয়দ ভাই দুজন শপথ গ্রহণ করলেন।

অন্যান্য ওম্‌রাহেরা যথাসাধ্য নজরানা দিয়ে বাদশাকে অভিনন্দন জানালেন।

এক বিরাট উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে যেন সারাটা দিনই কেটে গেল ফর্‌রুকসিয়রের।

সন্ধ্যাবেলা তিনি দরবার ছেড়ে হারেমে এলেন।

আজ তার মনে প্রাণে বিরাট তৃপ্তি।

নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছেন। সৈয়দ ভাইদের বিরাট শক্তি তার পেছনে—দিল্লী আর দূরে নয়।

হারেমে ফারুকউন্নিসার কাছেই এলেন তিনি।

ফারুকউন্নিসা একটা পবিত্র সৌন্দর্য্যের পশরা সাজিয়ে বসে ছিল হারেমে। তার সমস্ত নারী দেহটাকে ব্যপ্ত করে কি একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

সেই দিকে তাকিয়ে তৃপ্ত আনন্দের সংবাদটা যেন তৎক্ষণাৎ পরিবেশন করতে পারলেন না ফর্‌রুকসিয়র। তিনি শুধু মুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকলেন।

নীল জ্যোৎস্নার মাধুর্য্য দিয়ে ফারুকউন্নিসাই তাকাল তার দিকে।

সেই চোখের দিকে তাকিয়ে একটু যেন সঙ্কুচিত হলেন ফর্‌রুক-সিয়র।

পার্থিব জৈবিক উন্মাদনার সঙ্গে এর কোন সামঞ্জস্য নেই।

এই মুহূর্ত্তে যে জিনিষটি লাভ করেছেন তিনি, তা যেন খুলে বলা যায় না তাকে।

কিন্তু প্রশ্ন এল ফারুকউন্নিসার কাছ থেকেই, দরবারে আজ আনন্দ উৎসবের সাড়া পেলাম শাহজাদা?

—হ্যাঁ।

—কিসের জন্য?

—ওম্‌রাহরা আমাকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন।

আমার নামে খুত্‌বা পাঠ করা হোল।

—কিন্তু জাহান্দার শা জীবিত থাকতে?

কেমন একটু বিব্রত বোধ করলেন ফর্‌রুকসিয়র।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে উত্তর দিলেন, —জাহান্দার শার উপর সবাই বীতশ্রদ্ধ। মোগল সাম্রাজ্যের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। হারেমে নর্তকীদের নিয়ে বিলাসে মশগুল জাহান্দার শা। শাসনের দিকে মন নেই তার। চরিত্রহীন বাদশা।

—চরিত্রহীন! কেমন একটা সুরে কথাটা বলে ফর্‌রুকসিয়রের দিকে তাকাল ফারুকউন্নিসা।

—হ্যাঁ, চরিত্রহীন। বলল শাহজাদা।

—কিসে বুঝতে পারলেন?

—লালকুমারী নামে একটি মেয়ের জন্য কর্তব্যভ্রষ্ট হয়েছেন বাদশা।

—কিন্তু, সেটা চরিত্রহীনতা তো নাও হতে পারে?

—বিধর্মী মেয়ের রূপে মুগ্ধ হওয়া অন্যায়।

গম্ভীরভাবে একটু তাকিয়ে দেখল ফারুকউন্নিসা। তারপর বলল, —না। প্রেমের কাছে ধর্ম নেই। প্রেমই ধর্ম। আর তাছাড়া মোগলদের ইতিহাসে আন্তধার্মিক বিবাহের তো অভাব নেই?

ফর্‌রুকসিয়র বললেন, এখন আছে। আমরা বর্তমানে ইসলামকেই শ্রেষ্ঠ বলে জেনে নিয়েছি। আর তা ছাড়া জাহান্দার শার এটা যদি প্রেম হোত, তবে অন্য কথা ছিল। লালকুমারীকে তিনি বেগমের মর্যাদা দেননি, শুধু ভোগের সামগ্রী করে রেখেছেন।

সুরা ও নারীর বশবর্তী হওয়া মোগল বাদশার উচিৎ নয়।

অনেক্ষণ কিছু বলল না ফারুকউন্নিসা। কেমন একটা বিষাদ-মলিন ভাবে নীরব থাকলো যেন।

শাহজাদাই বললেন, তুমি কি সংবাদে খুসি হওনি?

নীরবতা ভাঙল ফারুকউন্নিসা—আচ্ছা শাহজাদা—

—বল ?

—আপনি যদি সিংহাসনে বসেন, তাহলে কি আমার সঙ্গে কোন সংস্রবই থাকবে না ?

—কেন ? তুমি আমার বেগম। তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্বন্ধ থাকবে। কোরান সাক্ষী করে তোমাকে আমি হারেমে নিয়েছি।

—আপনি যদি কখনো দিনের পর দিন আমার সঙ্গে হারেমে কাটান ?

—নিশ্চয়ই কাটাব।

তখন যদি আমিররা আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ? আপনাকে স্ত্রৈণ বলে ? যদি আপনাকে সিংহাসন চ্যুত করতে চায় ?

নিজের দুটো বাহু দেখালেন ফররুকসিয়র। বললেন,—এই দুটো বাহুই তার প্রতিবিধান করবে ফারুক।

একটু হাসল ফারুকউন্নিসা, তা হলে বলুন, প্রেম অপ্রেমের কথা এখানে অবান্তর। বাহুবলই মূল কথা। জাহান্দার শার অন্যায়টা লালকুমারীর প্রতি আকর্ষণ নয়, দুর্বলতা।

কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু হেসে ফারুকউন্নিসার দিকে তাকিয়ে থাকলেন শাহজাদা।

ফারুকউন্নিসা বলল, মনে রাখবেন শাহজাদা, দিল্লীর তক্তে তাউসে বসলে জীবনকে, প্রেমকে উপভোগ করবার সময় থাকবে না। বাঁচবার জন্য তখন শুধু রাজনীতির মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে। তখন—কথা সমাপ্ত করতে দিলেন না ফররুকসিয়র। এগিয়ে গিয়ে বুকের কাছে টেনে আনলেন তাকে। বললেন, তখন কোন ভয় নেই তোমার। তখনো তুমি তুমিই থাকবে।

—তবু যেন আমার কেন ভয় করে শাহজাদা—ভীত হরিণীর মত শঙ্কিত নয়ন তুলে বলল ফারুকউন্নিসা।

শাহজাদা তাকে আরো টেনে এনে বাহুর ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বেঁধে ফেললেন, কোন ভয় নেই তোমার ফারুক।

সেই অভয়দাতার বুকের মধ্যে ফারুকের নারী হৃদয়টা কাঁপতে থাকল শুধু—ধুক্ ধুক্…।

চার

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি খাঁ প্রকৃতপক্ষে বাংলার স্বাধীন নবাবে পরিণত হয়েছিলেন। তথাপি বাহ্যত তিনি নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন নি।

নাম মাত্র দিল্লীর অধীনতা বজায় রেখে, প্রকৃতপক্ষে বাংলায় তিনি এক নতুন সার্বভৌম ক্ষমতার সৃষ্টি করেছিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত তাই বাংলার নবাবী রূপে দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর জীবদ্দশায় তিনি স্বাধীন নবাবজাদার ভূমিকা গ্রহণ করেন নি।

রীতিমত তখনো তিনি দিল্লীর রাজকোষে নিয়মিত রাজস্ব পাঠিয়ে চলেছিলেন।

ঔরংজীবের জীবদ্দশায় তাকে একমাত্র বাংলার রাজস্বের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল।

ঔরংজীবের পরেও মোগল বাদশাহের একমাত্র নির্ভর ছিল বাংলার অর্থ।

বাহাদুর শা'ও বাংলার রাজস্ব পেয়েছেন।

জাহান্দার শা'ও নির্ভর করেছেন তাঁর উপর।

মোগল রাজপুত্রদের সবার লোভই বাংলার উপর।

বাংলা যেন অর্থের কামধেনু, চাইলেই অনেক কিছু পাওয়া যায়।

ফররুকসিয়রেরও লোভ ছিল বাংলার উপর।

তা' ছাড়া এই সময় বিশেষ ভাবে তাঁর অর্থের প্রয়োজন।

এর পরেও মুর্শিদকুলি খাঁ তার মিত্র নন বরং শত্রুই।

আজিম উশ্‌শানের সঙ্গে তার বিরোধ সর্বজনবিশ্রুত।

সুতরাং মুর্শিদকুলি খাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য তিনি তিমুর বেগকে পাঠিয়ে দিলেন।

বাংলার কেন্দ্র তখন মুর্শিদাবাদ।

ভাবী বাংলার পাদপীঠ তৈরী করেছেন মুর্শিদকুলি খাঁ সেখানে।

দরবারে বসে তিনি আক্রমণের সংবাদ পেলেন।

বুদ্ধিমতী কন্যা জিন্নেতুন্নেসা বেগম।

তিনি পিতার কাছেই থাকেন।

দুর্ভাগ্যবশত অপদার্থ স্বামী সুজাউদ্দিন তার মর্য্যাদা দিতে পারেননি।

তিমুরবেগের যাত্রার কথা শুনে পিতাপুত্রীতে পরামর্শ করতে বসলেন।

মুর্শিদাবাদের জেনানা মহলে মুর্শিদকুলি খাই এসেছিলেন পরামর্শের জন্য।

ক্লান্ত পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বিপদের আভাস পেয়েছেন জিন্নেতুন্নেসা বেগম?

জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি: কি হয়েছে আব্বাজান?

অনেক সমস্যার ভারে মুর্শিদকুলি খাঁ তখন একটু ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন যেন। কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

একটু বিষণ্ণভাবে বলেছিলেন তিনি, ইসলামের বড় দুঃসংবাদ বেটি।

—কেন আব্বাজান?

—এটা অভিশাপ।

—কি হয়েছে? একটু ব্যস্ত হয়েই জিজ্ঞেস করেছিলেন বেগম।

মুর্শিদকুলি খাঁ বলেছিলেন, মোগল শাহজাদারা স্বাভাবিক লোভের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছেন। প্রত্যেকেই সিংহাসনের জন্য লালায়িত।

আলমগীরের পর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শাহজাদা আর কেউ নেই।

কারো বিরাট ব্যক্তিত্বকে অন্যে মেনে নেবে না। আবার শত্রু পক্ষকে সম্পূর্ণ অপসারিত করবার ক্ষমতাও নেই কারো। ফলে সিংহাসন নিয়ে বিবাদ নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেই বিবাদে প্ররোচনা দিচ্ছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমীরেরা।

—কেন, কি হয়েছে আবার, আব্বাজান ?

—আবার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে বেটি। জাহান্দার শার কতৃত্ব মেনে নিতে রাজি নয় আজিম উশ্‌শানের পুত্র ফর্‌রুকসিয়র।

নিজেকে সে বাদশা বলে ঘোষণা করেছে। খুত্‌বা পাঠ করেছে নিজের নামে।

—তারপর ?

—স্বভাবতই পিতৃশত্রু মুর্শিদকুলি খাঁর দিকে নজর পড়েছে তার।

–কি করেছেন তিনি ? একটু শঙ্কিত ভাবেই জিজ্ঞেস করলেন জিন্নেতুন্নেসা বেগম।

—বিমর্ষভাবে বললেন মুর্শিদকুলি, আমার বিরুদ্ধে তিনি তিমুর বেগকে পাঠিয়েছেন !

—কেন ? যুদ্ধের জন্য ?

—মূল উদ্দেশ্য তাই। কিন্তু একটু ছলনা রেখেছেন। বলেছেন, এটা অভিযান নয়, মোগল বাদশা হিসেবে তাঁর রাজস্ব আদায় !

আমার কাছ থেকে রাজস্ব পেলেই তিনি আর কিছু বলবেন না।

জিন্নেতুন্নেসা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঠিক করেছ আব্বাজান ?

মুর্শিদলকুলি খাঁ বললেন, রাজস্ব নিশ্চয়ই দেব।

—কাকে ?

মোগল বাদশাকে।

—তুমিও কি তবে ফররুকসিয়রকে বাদশা বলে স্বীকার করে নিয়েছ ?

—না।

—তবে ?

—জাহান্দার শা'ই বাদশা। দেওয়ানী খাসই আমার দরবার। দিল্লী আমার রাজধানী। যে শাহজাদা দিল্লীর সিংহাসনে বসবেন তাকেই আমি বাদশা বলে নজরানা দেব।

—কিন্তু ফররুকসিয়র তো—

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, জিন্নেতুন্নেসা বেগম। অর্ধপথেই তাকে থামিয়ে মুর্শিদকুলি খাঁ বললেন, ফররুকসিয়রকে আমি সে কথাই বলব।

—কি আব্বাজান।

—বলব বাঙলার রাজস্ব পেতে হলে দিল্লীর মসনদে গিয়ে বোস আগে। ময়ূর সিংহাসন যার নেই, তাকে আমি বাদশা বলে মানিনে।

—যদি তিনি তা না শুনেন ?

—তবে যার নিমক খেয়েছি তাঁর সম্মান রাখার জন্য চেষ্টা করব।

—যুদ্ধ করবে ?

হ্যাঁ, আমি করিমবাদের দিকে সৈন্য পাঠিয়েছি। যদি ওরা ফিরে না যায়, তবে বাধা দেব।

—জিন্নেতুন্নেসা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাহলে জাহান্দার শার দলে ?

একটু হাসলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। বললেন, না বেটি, আমি কোন দলে নই। আমি শুধু মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে। দিল্লীর গদিতে যিনি আছেন তাঁকেই আমি সম্রাট বলে মানি। না হলে জাহান্দারের মত ব্যক্তির পক্ষে যোগদানের কোন সার্থকতা নেই, সে কাফের। সে হিন্দু মেয়ের প্রভাবে পড়ে পাপ করছে। সে রাজ কার্য্যকে অবহেলা করেছে, তাকে আমি ঘৃণা করি।

জিন্নেতুন্নেসা যেন একটু সাহস পেলেন। বললেন, আমিও তাই বলি আব্বাজান। জাহান্দার শার পক্ষে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। বরং—

—না, না, যেন গর্জ্জনের মত আওয়াজ বেরল মুর্শিদকুলির কণ্ঠ থেকে। তিনি বললেন, না মা। তা হয় না'। না মা, তা হয় না। দিল্লীর বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না। সুতরাং ফররুকসিয়র যদি দিল্লী অধিকার না করে এসে আমার কাছে রাজস্বের জন্য জবরদস্তি করতে চায়, তবে যুদ্ধ অপরিহার্য্য।

জিন্নেতুন্নেসা পিতার উত্তেজিত ভাব দেখে বললেন,—তোমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই আব্বাজান।

মুর্শিদকুলি বললেন, ভাবছি সুজাউদ্দিনকে একবার সংবাদ পাঠাব কিনা?

স্বামীর কথা শুনতেই কেমন একটু চমকে উঠলেন বেগম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে বললেন, সে তো ভাল কথা। তাকে এই বিপদের কথা জানিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলা ভাল।

কি যেন একটা পেয়ে গেলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস। প্রস্তুত হয়েই থাকতে বলি তাকে। এই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদ আসবার প্রয়োজন নেই। করিমবাদের পর ব্যবস্থা বুঝেই তাকে সংবাদ পাঠাব।

আবার জিন্নেতুন্নেসার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, আমি ঠিক এ কথাটাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম তোর কাছে। পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি। আসবার প্রয়োজন নেই তার। তাছাড়া উড়িষ্যাতে আলীবর্দ্দি খাঁর অধীনে দায়িত্ব ফেলে আসাটাও যুক্তিযুক্ত নয়। আলীবর্দ্দিকে আমি বিশ্বাস করিনে। বাংলার মসনদের দিকে তার লোভ। যে কোন সময় বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারে।

কথা বলতে বলতেই আবার ফিরে যাবার জন্য মুখ ফেরালেন মুর্শিদকুলি। এবং সম্ভবত নিজের মনের মধ্যে এ কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে আত্মভোলার মত বেরিয়ে গেলেন।

পিতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন জিন্নেতুন্নেসা বেগম।

অপরদিকে—করিমবাদের মাঠে তিমুর বেগ আর রসিদ খাঁন এসে

পৌঁছুলে—মুর্শিদকুলির বাহিনীর সঙ্গে দেখা হ'ল তাদের। নবাবী ফৌজের তরফ থেকে করিম খান তলব করে পাঠালেন রসিদ খানকে। শিবিরে দেখা হ'ল ফর্‌রুকসিয়রের তরফ থেকে রসিদ আর মুর্শিদকুলি খাঁর তরফে করিম খানের।

করিম খান জিজ্ঞেস করলেন, পাটনা থেকে হঠাৎ বাঙলায় সৈন্য পাঠাবার কারণ কি ফর্‌রুকসিয়রের?

রসিদ খাঁ বললেন, ফর্‌রুকসিয়র নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করেছেন। খুত্‌বা পাঠ হয়েছে তার নামে। সুতরাং হিন্দুস্থানের বাদশা এখন তিনি। বাঙলার রাজস্ব আদায় করতে পাঠিয়েছেন আমাকে।

করিম খাঁ বললেন, দিল্লীর মসনদে না বসে কখনো হিন্দুস্থানের বাদশা হওয়া যায় না। ফর্‌রুকসিয়র কি দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন?

রসিদ খান বললেন, শীগ্‌গীরই বসবেন।

—যেদিন বসবেন, সেদিন বাঙলার রাজস্বের জন্য আসবেন।

—কেন?

মুর্শিদকুলি দিল্লীর সিংহাসনে না বসা পর্য্যন্ত কাউকে হিন্দুস্থানের বাদশা বলে স্বীকার করেন না।

একটু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন রসিদ খান, বললেন, কে কি স্বীকার করেন, না করেন, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। আমরা স্বীকার করি ফর্‌রুকসিয়র আমাদের বাদশা সুতরাং রাজস্ব আমরা আদায় করবই।

করিম খান বললেন, মুর্শিদকুলি খাঁ যদি রাজস্ব না দেন?

—মুর্শিদকুলি খাঁকে গদিচ্যুত করা হবে।

—বেশ তবে তাই করবেন, আমার আর কিন্তু বলবার প্রয়োজন নেই, বলে সরে পড়লেন করিম খান।

রসিদ আরও তবে দাঁড়ালেন।

করিম খাঁ বললেন, তবে ফররুকসিয়রের বাদশাহী প্রমান করবার জন্য চেষ্টা করুন।

—বেশ একটু পরেই আমাদের দেখা হবে, বলে আরক্ত মুখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন রসিদ খান।

কিছুকাল পরেই, অস্ত্রের ঝঞ্চনায়, অশ্বখুরের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছিল করিমবাদের মাঠ !

বাঙলার আর বাদশার ফৌজে সংঘর্ষ বেধেছিল। রক্তে লাল হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্র।

ফররুকসিয়রের সম্মান রাখবার জন্য প্রাণ তুচ্ছ করে যুদ্ধ করলেন রসিদ খান কিন্তু লাভ হ'ল না কোন।

অবশেষে তার অধিকাংশ সৈন্যের সঙ্গে প্রাণ দিলেন রসিদ খান। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে কোনরকমে পালিয়ে বাঁচলেন তিমুর বেগ।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাটনায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় আর ফররুকসিয়র গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন বাঙলার সংবাদের জন্য। তাদের ভাবী সৌভাগ্যের পথে শুভসূচনা বাঙলা। বাঙলা তার ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করবে অনেকটা।

পাটনার বাদশাহী দরবার।

ফররুকসিয়র হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলেই ঘোষিত হয়েছেন :

প্রধান উজীর হয়েছেন এলাহাবাদের সুবেদার আবদুল্লা খান আর ভাই হুসেন খান হয়েছেন সেনাপতি।

এই সুহৃদ ভ্রাতৃদ্বই আজ ফররুকসিয়রের প্রধান অবলম্বন। দরবারে ওদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন মনসবদার ইব্রাহিম খান প্রত্যেকেই চিন্তান্বিত।

প্রত্যেকেই উৎকণ্ঠিত তারা।

বিশেষ চঞ্চল মনে হচ্ছে ফররুকসিয়রকে।

মুর্শিদকুলি খানকে তিনি চেনেন।

মুর্শিদকুলি খানকে তিনি জানেন।

নীতিবাগীস লোক। বিদ্রোহীকে বাদশা বলে মানবেন কিনা তিনি সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আর তা ছাড়া আজিম উশ্‌শানের সঙ্গে তার খুব বনিবনা ছিল না।

ফর্‌রুকসিয়রকে বাদশা বলে মেনে নেবার আগে তিনি হয় তো বাঙলাতে স্বাধীন নবাবী স্থাপন করেই বসবেন।

কিন্তু এই মুহূর্তে জাহান্দার শার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার পর বাঙলার গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে অনেক।

বাঙলার অর্থ—ভাবী সাম্রাজ্যের সহায়ক হবে। আর তা-ছাড়া দিল্লীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে পেছনে বাঙলাকে শত্রু হিসাবে রেখে নিরাপত্তার কথা ভাবাও ভয়ানক।

ফলে তাঁর উৎকণ্ঠা।

ফলে তাঁর গভীর চিন্তা।

ফর্‌রুকসিয়রের এই চিন্তা লক্ষ্য করে হুসেন খাঁ বললেন, সম্রাটকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?

তরুন বাদশা বললেন, হ্যাঁ খাঁ সাহেব।

—কেন?

—বাঙলার সংবাদ না জানা পর্য্যন্ত আমি শান্ত হতে পাচ্ছি না।

একটু হেসে হুসেন খাঁ জবাব দিয়েছিলেন, ভয়ের কিছু নেই জনাব। নিশ্চিন্ত জানবেন মুর্শিদকুলি খাঁ আমাদের প্রস্তাব স্বীকার করে নেবেন।

—কেন?

—তিনি মুসলমান। নীতি পরায়ণ। আলমগীরের হাতের তৈরী। জাহান্দার খান হিন্দু মেয়ের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তিনি তা সহ্য করবেন না। কাফেরকে ক্ষমা করবেন না তিনি।

ফর্‌রুকসিয়র বললেন, কিন্তু তিনি আমার পিতৃশত্রু ছিলেন। যে কথা ভেবে হয়তো আমাদের দিকে নাও আসতে পারেন।

এবার মুখ খুললেন আবদুল্লা খাঁ,—তাতেই বা ভাবনা কি জাহাপনা। রসিদ খাঁ আর তিমুর বেগতো শূন্য হাতে যায়নি।

একটু ম্লান ভঙ্গিতে ফর্‌রুকসিয়র তাকালেন আবদুল্লা খানের দিকে ;—কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় বাহিনী মুর্শিদকুলি খাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে ?

আমি জানি তার সন্ধানেও বিরাট শিক্ষিত বাহিনী রয়েছে। সে বাহিনী নিয়ে বাঙলায় এক স্বাধীন নবাবী স্থাপন করবার স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

আবদুল্লা খান বললেন, কিন্তু আমার মনে হয় না প্রত্যক্ষভাবে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস করবেন। তার কারণ তিনি জানেন আপনার এখানে প্রচুর বাদশাহী ফৌজ রয়েছে। আপনার সঙ্গে আমি রয়েছি আর রয়েছে আমার এলাহাবাদী ফৌজ। এক হুসেন খাঁ আর ইব্রাহিম খাঁর যুদ্ধ কৌশলের কথা তার অবিদিত নয়। এ অবস্থায় আমাদের প্রস্তাব গ্রহণই করবেন তিনি।

ফর্‌রুকসিয়র বললেন, তবু যদি তিনি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ না করেন ?

আবদুল্লা উত্তর দিলেন, তাহলে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করবার নির্দ্দেশ দিয়েছি রসিদ খান আর তিমুর বেগকে।

বাকীটুকু পুরণ করলেন ভাই হুসেন আলী, আর যদি তিমুর বেগ, রসিদ খাঁ ব্যর্থ হনও, রয়েছেন ইব্রাহিম খাঁ এবং এই বান্দা। ইব্রাহিম খাঁর দিকে সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন যেন হুসেন খান

ইব্রাহিম খান উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই জনাব। এ বান্দা বাদশার হুকুম তামিল করবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

আবদুল্লা বললেন, আর তাছাড়া বাঙলা এখন প্রশ্নই নয়। দিল্লী

অধিকার আমাদের প্রথম কথা। দিল্লীতে ওমরাহেরা জাহান্দার শার প্রতি সকলেই বিরূপ। এমন কি ওদের অনেক সসৈন্যে পাটনায় আমাদের কাছে এগিয়ে আসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সে সংবাদ আমরা যেদিন পাব, সেদিন দিল্লীর দিকে এগিয়ে যাব। দিল্লী একবার হাতে এলে তখন বাঙলাকে দেখা যাবে।

ফর্‌রুকসিয়র এবার প্রতিবাদ করলেন, বয়স তার অল্প হলেও যুদ্ধ বিদ্যা তার অজ্ঞাত নয়, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ গ্রহণও করেছেন তিনি, বললেন,—বাঙলাকে পেছনে শত্রু রেখে দিল্লীতে অগ্রসর হওয়া কি আমাদের উচিত হবে?

একটু যেন বিরক্ত হয়েই হুসেন আলী বললেন, বাঙলা পেছনে শত্রু হয়ে থাকবে, একথাই বা ভাবছেন কেন জাহাপনা?

আমি মুর্শিদকুলি খাঁকে চিনি তাই। উত্তর দিলেন জাহাপনা ফর্‌রুকসিয়র।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে বান্দা উচ্চ নিনাদে তিমুর্‌ বেগের নাম ঘোষণা করল।

শুনে যেন দরবারস্থ সকলেই চমকে উঠলেন একটু।

কি সংবাদ নিয়ে এল তৈমুর্‌ বেগ, কে জানে।

আবদুল্লা আর হুসেন আলি ভাবলেন—রাজস্ব।

ফর্‌রুকসিয়র,—প্রত্যাখ্যান।

ঠিক সেই মুহূর্তে আবদুল্লা দরবারের বান্দাকে আদেশ করলেন তিমুর বেগকে নিয়ে আসবার জন্য।

বান্দা কুর্নীস করে বাইরে চলে গেলে এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে থাকল দরবার। যেন হৃদ-স্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছে সবার।

হুসেন আলী আর আবদুল্লা নীরব দৃষ্টি বিনিময়ও করে নিলেন। মুহূর্ত শুধু। তারপর সশরীরে এসে দাঁড়ালেন তিমুর বেগ। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মনে হল তাকে।

কুর্নীস করে দাঁড়াল তিমুর্‌ বেগ।

তার দিকে কেমন একটা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালেন ফর্‌রুকসিয়র।

কিন্তু শকুনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিমুর বেগের অপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখলেন আবদুল্লা আর হুসেন আলী।

নীরব, নতশীর তিমুর বেগ।

আবদুল্লা জিজ্ঞেস করলেন, বল ; বাঙলার খবর কি ?

কম্পিত এবং ভগ্ন গলায় বলল তিমুর বেগ, ভাল নয় জনাব।

তীক্ষ্ণ নজরে তার দিকে তাকিয়ে বললেন আবদুল্লা, কেমন ? তিনি কি রাজস্ব দিতে প্রস্তুত নন!

—না।

—কি তার বক্তব্য ?

—তার বক্তব্য, তিনি ফর্‌রুকসিয়রকে সম্রাট বলে স্বীকার করেন না, মুর্শিদকুলির মতে দিল্লীর মসনদে যিনি বসেননি তিনি বাদশা নন। সুতরাং তাকে রাজস্ব দেবার প্রশ্নই উঠে না,

—রাজস্ব না দিলে মুর্শিদাবাদ আক্রমনের কথা বলেছিলাম তোমাকে, তার কি করেছ?

মাথা আরো নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল তিমুর বেগ।

উত্তেজিত হয়ে যেন চিৎকার করে উঠলেন—আবদুল্লা, কৈ উত্তর দাও।

মুখ না তুলেই জবাব দিল তিমুর বেগ, মুর্শিদাবাদ আমরা যেতে পারিনি জনাব। করিমবাদের মাঠেই তিনি আমাদের বাধা দেন।

—তার পর ?

—আমরা পরাজিত হয়েছি।

এ কথা শুনবা-মাত্রই যেন জ্যামুক্ত ধনুকের মত লাফিয়ে উঠলেন ফর্‌রুকসিয়র।

তৎক্ষণাৎ হুসেন আলী উঠে দাঁড়ালেন। সভাস্থ সকলেই।

হুসেন আলী বিনীত ভাবে বললেন, আপনি উত্তেজিত হবেন না জনাব। বসুন। সবটা আগে শুনে নিন, হতাশ হবার কিছু নেই এতে।

আবার বসলেন ফর্‌রুকসিয়র।

আবদুল্লা জিজ্ঞেস করলেন, রসিদ খান কোথায় ?

—দুহাতের করতলে মুখ রেখে তিমুর বেগ বলল, তিনি নিহত হয়েছেন।

ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে আবার লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন ফর্‌রুক-সিয়র, হুসেন আলী তাকে বসিয়ে দিলেন।

এবার আবদুল্লাই যেন একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে তাকালেন ফর্‌রুক-সিয়রের দিকে।

গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন ফর্‌রুকসিয়র, কি করবেন ?

ধীরে বললেন আবদুল্লা, ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না জনাব। আবার ব্যবস্থা করতে হবে।

উত্তেজিত ভাবেই বললেন ফর্‌রুকসিয়র, কি আর ব্যবস্থা করবেন, আমি নিজেই মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হব, ঐ কাফেরটাকে শাস্তি দিতেই হবে।

একটু হাসলেন আবদুল্লা, শাস্তি দিতেই হবে ঠিক, কিন্তু তাই বলে জাহাপনার নিজের যাবার প্রয়োজন নেই। এখনো এই বান্দারা রয়েছে আপনার হুকুম তামিল করবার জন্য।

—কিন্তু আমি নিজে হাতে ওকে শাস্তি দিতে চাই।

—বাদশার যোগ্য কার্য্যই বটে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই মুহূর্তে দিল্লীর ডাক আসতে পারে। সেই মুহূর্তের জন্য আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

মুর্শিদকুলি খাঁকে শাস্তি দেবার জন্য আমরা অন্য ব্যবস্থা করছি জনাব।

—বলুন ? প্রশ্নের ভঙ্গিতে তাকালেন ফর্‌রুকসিয়র।

আবদুল্লা বললেন, ইব্রাহিম খাঁ অভিজ্ঞ সেনাপতি, ওকেই বাঙলায় পাঠানো যাক।

ফর্‌রুকসিয়র ইব্রাহিম খাঁর দিকে তাকালেন।

উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নীস করলেন ইব্রাহিম খাঁ, বললেন, জাহাপনা এ বান্দা আপনার জন্য জান দিতে প্রস্তুত।

প্রশ্ন করলেন বাদশা-মুর্শিদকুলিকে শাস্তি দিতে পারবেন ?

—আল্লা জানেন। একটু বিনয় করলেন ইব্রাহিম খাঁ। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার শক্তির পরিচয় দেবার জন্য বললেন, তবে একথা আমি দিতে পারি জনাব যে, হয় বাঙলার রাজস্ব নয়তো মুর্শিদকুলি খাঁর শির আমি আপনাকে উপহার দেবই।

একটু আশ্বস্থ বোধ করলেন ফররুকসিয়র ; বললেন বেশ তবে বাঙলা অভিযানে আপনাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করছি। এই মুহূর্তে আপনাকে পাঁচ হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করলাম আমি, আপনি অবিলম্বে বাঙলার দিকে অগ্রসর হোন।

মুর্শিদকুলি ঐদ্ধত্বের জবাব দিতেই হবে।

ইব্রাহিম তৎক্ষণাৎ তরবারি কোষমুক্ত করে কুর্নীস জানালেন তাঁকে। আবতুল্লা আর হুসেন একটা কৌতুককর দৃষ্টি বিনিময় করলেন পরস্পরে।

পাঁচ

লাল কেল্লা।

রক্তের ঔদ্ধত্যে নয় ; নৃত্যের কমনীয়তায় নতুন রূপ লাভ করেছে লাল কেল্লার অঙ্গে অঙ্গে রূপ মিলিয়ে লালকুমারী তার প্রাণের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লালকুমারীর সেই উদ্ধত যৌবনের প্রবল আকর্ষণে মুগ্ধ বাদশা জাহান্দার শা।

এতটা মুগ্ধ যে তার ধ্যান, জ্ঞান, সমস্ত কিছু আজ লালকুমারী। এমন কি রাজকার্য্য আজ বাদ দিয়েছেন তিনি তার জন্য। দেওয়ানী খাসে আর বাদশার দর্শন মেলা ভার।

সামান্য আমীরের হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তুলে দিয়ে তিনি সাকি আর সুরা নিয়ে মুগ্ধ হয়ে আছেন লালকুমারীর দিকে ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি নিয়ে।

এমন কি বেগম মহলে পর্য্যন্ত যাবার অবসর নেই তার।

মুগ্ধ হয়ে আছেন আর্শীমহলে লালকুমারীর সহস্র প্রতিবিম্বিত রূপের দিকে তাকিয়ে।

সাম্রাজ্য, শাসন, আত্মীয় স্বজন, পুত্র পরিজন সকলের হাত থেকে আজ তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে লালকুমারী।

কিন্তু তবু তাঁর মনে সুখ নেই।

সুখ নেই নানা কারনে।

পুরুষের গদ গদ আত্মসমর্থনে প্রেমের পরিতৃপ্তি লাভ করা যায় না।

জাহান্দার শা সুন্দর বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বীরত্বের সংমিশ্রণ না হলে পুরুষের পুরুষত্ব খোলে না।

নারী পুরুষের মধ্যে দ্বিতীয় নারী নয়. পুরুষের খোঁজ করে। সেই পুরুষ না পেলে অতৃপ্ত হয় সে।

লালকুমারীরও তাই হয়েছে।

নর্তকী সে!

রূপ পশারিণীও।

বাদশা জাহান্দার শা আজ তার রূপ মুগ্ধ স্তাবক।

প্রথম প্রথম ভালই লেগেছিল তার।

সামান্য নর্তকীকে রাজপ্রাসাদে তুলেছেন তিনি।

মহিষীর চেয়েও অর্ধেক মর্য্যাদা দিয়েছেন অকৃপণ আত্মসমর্পণে।

লালকুমারীর নামে প্রাসাদ স্থাপণ করেছেন।

কিন্তু অল্প দিনেই তার নর্তকী হৃদয় হাঁপিয়ে উঠেছে।

মুক্ত পাখির স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ আর তার নেই।

আর্শীমহলের ঐশ্বর্য্য যেন পিঞ্জরের মতন তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে।

জাহান্দার শা নিজে সে পিঞ্জরের মুখে জাগ্রত প্রহরী। অনবরত প্রাপ্তির মধ্যে একটা একঘেয়েমি আছে। একই জিনিষ অনবরত ভাল লাগেনা।

প্রেম যতই সুন্দর হোক, বিরহ না হলে তা উপভোগ্য হয় না। প্রিয়তম যতই সুন্দর হোক, অদর্শন না হলে তার রূপ ফুটেনা। একটু বিরহ, একটু অদর্শন যেন লালকুমারীর কাম্য।

তা ছাড়া ওর রূপ-আকর্ষণ থেকে একটু দূরে রাখার প্রয়োজন আছে বাদশাকে।

লালকুমারীর জন্য রাজকার্য্য অবহেলা শুধু জাহান্দার শারই নয় লালকুমারীরও ক্ষতি করবে।

মোগল বংশে উচ্চাভিলাসি শাহজাদার অভাব নেই। যে কোন মুহূর্তে তারা সিংহাসনের জন্য হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কোন সুযোগ পেলে জাহান্দার শাহকে হত্যাও করতে পারে তারা।

যদি তাই হয় তবে তার ভবিষ্যৎ কি?

সেই ভবিষ্যতের কথা মনে করেই লালকুমারী আজ মনে মনে ঠিক করেছে, বাদশাকে বলতে হবে।

বাদশাকে বলতে হবে আপনি উঠুন, জাগুন। তাই আজকের আসরে বাদশা যখন স্বপ্নাচ্ছন্ন দুটি চোখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, সুর তোল লালকুমারী, বিষন্ন একটা রূপ নিয়ে লালকুমারী শুধু বাদশার দিকে তাকিয়ে থাকলো। সুরের মূর্চ্ছনা তুলে রোজকার মতন তৎক্ষণাৎ বাতাসে একটা শিহরণ আনল না সে। এই প্রথম ব্যাতিক্রম।

তার সেই বিষন্ন চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন জাহান্দার শা, কি হয়েছে তোমার লালকুমারী? তোমাকে বিষন্ন দেখাচ্ছে কেন?

লালকুমারী বলল, আমার বড় ভয় হচ্ছে বাদশা।

আশ্চর্য্য হয়ে তার দিকে তাকালেন বাদশা, ভয়! কিসের ভয়!

লালকুমারী বলল, আপনার জন্য ভয় বাদশা।

—আমার জন্য।

—হ্যাঁ।

—কেন?

লালকুমারী চোখমুখে একটা বেদনার ছায়া টেনে বলল, হয়ত আমি আপনার ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াব।

—কেন বলতো?

—আপনি আমার জন্য বিশ্বের সব কিছু ত্যাগ করেছেন—

স্বপ্নালু চোখ দুটিকে আরো সুন্দর করে বাদশা তাকালেন লালকুমারীর দিকে, বললেন প্রেমের জন্য যে এমনি সব কিছু ত্যাগ করতে হয়, নিজেকে নিঃস্ব করতে হয়।

লালকুমারী বলল, কিন্তু জাহাপনা, যদি এই প্রেম আত্মহননে নিয়ে যায়, তবে তা অন্যায় নয় কি? আমি যখন দেখতে পাচ্ছি, আমার জন্য আপনি সর্বনাশের পথে তলিয়ে চলেছেন। রাজকার্য্য অবহেলা করেছেন। আত্মীয় স্বজন আপনার চতুর্দিকে যে ষড়যন্ত্রের চাল চেলে চলেছে আপনি তা চোখেও দেখছেন না। মোগল ইতিহাসে এর পরিণাম যে কি, আপনার তো তা অজানা নয় জাহাপনা?

থামল একটু লালকুমারী।

বাদশা কেমন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কোন কথা বললেন না।

লালকুমারী আবার বলল, আমার জন্য যদি, আপনার এই বিপদ হয় খোদাবন্দ, তাহলে আমকে বিদায় দিন। আমি আপনার ক্ষতি দুচোখে দেখতে পারব না। তার চেয়ে আমি দূরে চলে যাই।

বাদশা মৃদু দুটি দৃষ্টি মেলে তখন শুধু লালকুমারীকে দেখছিলেন। তিনি বললেন, কিন্তু আমি যে তোমাকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে পারিনা লাল।

—কেন ?

আমি তোমায় ভালবাসি।

লালকুমারী বলল, খোদাবন্দ বাঁদীর অপরাধ নেবেন না। এখন প্রশ্ন করব ?

—বল ?

—ভালবাসা কি শুধু প্রিয়ার রূপ পান, না তার সান্নিধ্য লাভ করা ? তার সুখদুঃখের দায়িত্বও কি প্রেমিকের নয় ?

—নিশ্চয়। বল তোমার কি অসুখ ? বাদশা যেন বিষাদের দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন।

লালকুমারী বলল, অসুখ আমার কিছু নেই খোদাবন্দ। আপনার দোয়ায় মোগল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা সুখী ব্যক্তি বোধ হয় আমি—কিন্তু—

—কিন্তু ? আগ্রহ পূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন বাদশা।

—কিন্তু আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অসুখ অদূর ভবিষ্যতে ঘনিয়ে আসছে ?

তবু হাসলেন বাদশা, ও তোমার চিত্ত বিকলন।

প্রতিবাদ করল লালকুমারী, না বাদশা, এ আমার চিত্ত বিকলন নয় বা কল্পনায় প্রস্তুতও নয়। আমি স্পষ্ট অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। আপনি নর্তকী মহলে দিবারাত্র রয়েছেন। কোন খোঁজ খবর রাখছেন না সাম্রাজ্যের। প্রজারা অসন্তুষ্ট, আমীরেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। মোগল সম্রাটের কাছে তারা এতটা ঔদাসিন্য আশা করেনি। এখনো সময় আছে, আপনি আবার দরবারে যান।

—দরবার অমার ভাল লাগে না।

—কিন্তু আমাদের ভালর জন্যই যে আপনাকে যেতে হবে খোদাবন্দ।

—তোমায় কোন ভয় নেই। আশ্বাসের ভঙ্গিতে বললেন জহান্দার শা। লালকুমারী হতাশ দৃষ্টিতে তাকাল এবার। বুঝল বাদশা

তখন কর্ম্মের বাইরে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে নইলে দুজনেরই বিপদ। সুতরাং বাদশাকে জাগরিত করবার জন্য লালকুমারী আবার বলল, আপনি কি জানেন যে এখন পর্য্যন্ত অনেক সাহজাদা রয়েছেন যারা আপনার প্রাধান্য স্বীকার করেন না ?

জাহান্দার শা নিতান্ত বিচারহীন কথা বললেন,—তাতে আমার কিছু মাত্র এসে যায় না, কারণ আমি হিন্দুস্থানের বাদশা।

—কিন্তু সমস্ত হিন্দুস্থান কি আপনার ফরমান মেনে চলে ?

—চলে।

—না খোদাবন্দ। চলে না।

—না ?

হ্যাঁ।

—বল কে তা অস্বীকার করছে ?

লালকুমারী নর্তকী মহলে থাকলেও সাম্রাজ্যের অনেক খবরই সে রাখত।

নিজের স্বার্থের জন্য তাকে এসব রাখতে হোত।

গুপ্তচরের স্থান যে পাটনার ঘটনার সংবাদ পেয়েছিল।

অবশ্য ফর্‌রুকসিয়র যে নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করেছে ততটা কেউ জানত না। কিন্তু সে শুনতে পেয়েছিল যে আবদুল্লা আর হুসেন আলী তাকে বাদশার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে। তাই বলল,—পাটনায় আজিম উশ্‌শানের ছেলে ফর্‌রুকসিয়র। সে আপনাকে মানতে চায় না খোদাবন্দ। আর এ বিষয়ে তাকে আস্কারা দিচ্ছে আবদুল্লা আর হুসেন আলী।

—হুম্, একটু গম্ভীর হলেন বাদশা, কিন্তু কিছু বললেন না। একটু চিন্তান্বিত হলেন যেন তিনি।

তা লক্ষ্য করে লালকুমারী বলল, আপনি কি ওখবর রাখেন জাহাপনা ?

বাদশা বললেন, আমার সত্য মনে হয় না, তবে মুর্শিদকুলি খাঁ নিশ্চয়ই আমাকে জানাতেন।

এইবার যেন একটু সুযোগ পেল লালকুমারী, বলল, জানিয়েছেন কি না তাই বা আপনি কি করে জানেন? আপনি তো দরবারের কোন সংবাদই রাখতে চান না।

জাহান্দার শা বললেন, রাখবার মত সংবাদ হলে নিশ্চয়ই রাখব, এ সব অতি তুচ্ছ ঘটনা; আমি হয়ত পাইনে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মুখোমুখী দাঁড়াবার ক্ষমতা ওদের কারও নেই। ফরুক্কসিয়রের যদি ক্ষমতা থাকে বিদ্রোহ করার—তখন দেখা যাবে।

—কিন্তু বিদ্রোহ হবার আগেই ব্যবস্থা করা সঙ্গত নয় কি? রোগ হবার পর সারিয়ে তোলার চেয়ে রোগ না হতে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু বাদশা যেন শুভ পরামর্শ শুনতে মোটেই রাজি নন।

তিনি সে কথা শুনে বললেন, লাল ও কথা থাক। অনেকক্ষণ হয়েছে। এবার তুমি গান গাও। সুরা দাও পেয়ালা ভরে। তোমার গানের মধ্যে ডুবে থাকতে দাও আমাকে।

কিন্তু লালকুমারী তৎক্ষণাৎ বাদশার আদেশ কবুল করতে প্রস্তুত হ'ল না। শেষ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত হ'ল সে। বাদশার সঙ্গে যে তারও ভবিষ্যত জড়িয়ে রয়েছে।

সমস্ত বেদনা মুছে এবার মদির চোখ টেনে সে বাদশার অত্যন্ত কাছে চলে এল। তার পর কুসুমবৃন্তের মত কোমল দুখানি বাহু দিয়ে ঘিরে ধরল বাদশাকে।

বাদশা স্বপ্নালু চোখ দুখানি নিমিলিত করার ভঙ্গিতে ডাকলেন, লাল। লাল একহাতে সুরার পাত্র তুলে দিল বাদশাকে।

বাদশা যেন আত্মসমর্পণ করলেন।

লালকুমারী বলল, আমাকে কথা দিন খোদাবন্দ।

—বল কি কথা।

—আপনি রোজ একবার করে দরবারে যাবেন।

সহসা কথা দিতে পারলেন না বাদশা। লালের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বাহু বেষ্টন আরো দৃঢ় করল লাল। ঝুঁকে পড়ল সে বাদশার উপর। তারপর তার গোলাপ রঙের ঠোঁট দুটো দিয়ে কয়েকটি মৃদু চুম্বন করল বাদশার কপালে।

বাদশা যেন সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে গেলেন।

লালকুমারী বলল, কথা দিন খোদাবন্দ।

বাদশা বললেন, আলবৎ যাব।

অপরদিকে মুর্শিদাবাদ হারেমেও এমন আলোচনা হচ্ছিল দুজনে। প্রণয় প্রণয়ীতে নয়। প্রণয় বঞ্চিতা এক কন্যা আর তার পিতার মধ্যে।

জিন্নেতুন্নেসা আর মুর্শিদকুলি খাঁর মধ্যে।

বেগম মহলে বসে জিন্নেতুন্নেসা তখন হয়তো আপনার অদৃষ্টের কথাই ভেবে চলেছিলেন। স্বামী সুজাউদ্দিন অপদার্থ, চরিত্রহীন। মদ এবং নারীর মোহে প্রকৃতপক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

জিন্নেতুন্নেসা ইচ্ছে করলে এমন অপদার্থ স্বামীকে পৃথিবী থেকে সড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারত।

কিন্তু বাঙলা দেশের আবহাওয়া, তার পরিবেশ মনের মধ্যে তার বঙ্গললনার কমনীয়তা জাগিয়ে তুলেছিল।

যৌবন উপভোগের প্রয়োজনে তাই স্বামীকে অস্বীকার করে বিলাসে নিমগ্ন হওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর।

সম্ভব হয়নি বলেই—স্বামী বিরহের বিষণ্ণ এক বেদনা ছিল তার মধ্যে।

নির্জন প্রকোষ্ঠে বেগম মহলে বসে বোধ হয় তাই বিমর্ষ হয়েছিলেন তিনি।

এমন সময় সেখানে প্রবেশ করলেন মুর্শিদকুলি খান।

কেমন বেদনা ক্লিষ্ট মনে হয়েছিল তাকেও।

পিতার আগমনে হঠাৎ চমক ভেঙ্গে তাকিয়েছিল জিন্নেতুন্নেসা।

স্বামী সোহাগ বঞ্চিতা নারী, পিতার স্নেহের আশ্রয়ে বেঁচে আছে এখন।

পিতাকে শ্রদ্ধা আর ভালবাসা দিয়ে নিজের বঞ্চনার ক্ষতিটুকু পুরণ করে নেবার চেষ্টা করছে সে।

পিতার এই বিমর্ষ ভাব দেখে তৎক্ষণাৎ সে চমকে উঠল যেন।

নিজের একাকিত্বের বেদনাও নিমেষে ভুলে গেল।

জিজ্ঞেস করল সে, কি হয়েছে আব্বাজান আপনার ?

কন্যার পাশে এসে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন মুর্শিদকুলি। বললেন, বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি মা, আর যেন পারছি না।

এর একটা অর্থ আছে। সে ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থ জিন্নেতুন্নেসার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

মুর্শিদকুলি ঔরংজীবের ধর্মীয় গোড়ামীতে প্রভাবিত হয়ে তার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছেন। অবশিষ্ট একমাত্র কন্যা জিন্নেতুন্নেসা, তাকে বিবাহ দিয়ে জামাতার মধ্যে পুত্রের সন্ধান করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সুজাউদ্দিন তাকে নিতান্ত ভগ্নহৃদয় করেছে।

সে দায়িত্বহীন, সে লম্পট, সে চরিত্রহীন।

পুত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করা দূরে থাক, আরো কন্যা জিন্নেতুন্নেসাকে অবহেলা করে মুর্শিদকুলির দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়েছে।

সুতরাং বৃদ্ধ যখন ক্লান্তির কথা বলেন, জিন্নেতুন্নেসা তার মধ্যে কি ইঙ্গিত লুকানো আছে ভেবে ব্যথা পান।

পুত্র এবং জামাতার অভাব পুরণের জন্য জিন্নেতুন্নেসা নিজেই চেষ্টা করেন।

সুতরাং পিতার ক্লান্তির কারণ জেনেও তার কিছু করনীয় আছে কিনা একথা জানবার জন্য জিন্নেতুন্নেসা জিজ্ঞেস করলেন, নূতন কিছু দুঃসংবাদ পেয়েছেন কি আব্বাজান ?

এই মুহূর্তে বাঙলা তথা ভারতের এক বিপর্যয়।

গৃহযুদ্ধ সমাসন্ন।

সেই গৃহযুদ্ধে মুর্শিদকুলি খাঁরও নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়।

সম্ভব যে নয় তার প্রমাণ করিমবাদের মাঠে পাঠান ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

সেই যুদ্ধ মুর্শিদকুলি খাঁর পক্ষে নিতান্ত চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে যদিও তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করেছেন, তথাপি সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত কিনা সে কথা নিঃসন্দেহে ব... .ল না।

সেই ভবিষ্যৎ বপদের স্পষ্ট ইঙ্গিত মুর্শিদকুলি খাঁ পেয়েছেন কিনা সেটাই জানতে চান জিন্নেতুন্নেসা।

জিন্নেতুন্নেসার উত্তরে মুর্শিদকুলি খাঁ বললেন, না মা। এখনো কোন দুঃসংবাদ পাইনি। তবে অদূর ভবিষ্যতে যে আবার গোলযোগের সম্মুখীন হতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার।

—কেন? প্রশ্ন করলেন জিন্নেতুন্নেসা।

মুর্শিদকুলি বললেন, ফররুকসিয়র একবার পরাজিত হয়ে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তার পিতা আজিম উশ্শানের মত তাকেও আমি ভাল করেই চিনি। ভয়ানক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সে।

সুতরাং কালবিলম্ব না করে আমাকে শায়েস্তা করার জন্য অবিলম্বে সে বাহিনী পাঠাবে। তাই ভাবছি—

—ভাববার কি আছে আব্বাজান। যেমন করিমবাদের মাঠে ওদের ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছেন, এবারও তেমনি ব্যবহার করুন।

—না, এতে করে সমস্যার সমাধান হবে না।

—কেন?

—কারণ এবার সে আরো বেশী সৈন্য পাঠাবে। এমন কি মারাঠাদেরও বাঙলার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পারে। তাই যদি হয় তবে আমাদের বেশ বেগ পেতে হবে।

কি যেন একটু ভাবলেন জিন্নেতুন্নেসা। তারপর বললেন, আচ্ছা আব্বাজান, জাহান্দার শা আর ফররুকসিয়রের মধ্যে কে জিতবে বলে

আপনার ধারনা ? মুর্শিদকুলি খাঁ বললেন, দেখ, বীরত্বের দিক থেকে বলতে গেলে জাহান্দার শারই জেতা উচিৎ। কিন্তু আরো কতকগুলি কারণ ঘটেছে যার জন্য মনে হচ্ছে তার পক্ষে জেতা সম্ভব নয়।

—কি সে কারণ ?

—জাহান্দার শা, রমণী বিলাসী হয়েছেন। তিনি রাজকার্য্য অবহেলা করেছেন, ওম্‌রাহেরা তার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট। রাজকর্য্যে প্রেম, গৃহবিলাস এসবের স্থান নেই। দেশ আর প্রজাই একমাত্র লক্ষ্য।

জিন্নেতুন্নেসা বললেন, আচ্ছা আব্বাজান তাহলে আপনি এক কাজ করুন না কেন, আপনি ফর্‌রুকসিয়রের দাবীই মেনে নিন।

মুর্শিদকুলি খাঁ বললেন, সে সময় আর নেই মা। প্রথমটা একটু মিটমাট করে নিলেও হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু এখন অসম্ভব। ফর্‌রুক-সিয়রের সঙ্গে মিটমাট করে নিলেও সে আমাকে ক্ষমা করবে না। সিংহাসন পেয়েই আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করবার চেষ্টা করবে।

—তাহলে কি করবেন ভেবেছেন ?

—বাধা দেব ঠিক করেছি। কিন্তু ফল কি হবে ভেবে পাচ্ছিনা।

পিতার এই সমস্যার কথা ভেবে ভারি বেদনা বোধ করল জিন্নেতুন্নেসা। এই বিপদের দিনে পুত্রের অভাবেই ক্লান্ত হয়েছে মুর্শিদকুলি খাঁ, একমাত্র জামাতা সুজাউদ্দিন খাঁ, চরিত্রহীন, লম্পট।

জিন্নেতুন্নেসা ভাবলেন যথাসম্ভব নিজেই আজ পুত্রের ভূমিকা গ্রহণ করবেন। এই সমস্যার মুহূর্তে একটা কিছু করতেই হবে তাঁকে, বললেন, আচ্ছা আব্বাজান আপনি এক কাজ করুন না কেন ?

—কি ?

—শক্তিতে যদি না হয়, বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হয়। আপনি তাই করুন।

—বল কি করব ?

ফর্‌রুকসিয়রকে পেছন থেকে ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা করুন, যেন সে বাঙলা আক্রমন করতে না পারে।

—কি রকম ?

—এখন আপনি সম্রাটকে অবিলম্বে পাটনার অবস্থা জানান। পেছন থেকে ফররুকসিয়রকে আক্রমণ করবার ব্যবস্থা করুন তিনি। যদি তিনি তার মোহ কাটিয়ে উঠতে না পারেন, তবে—

মুর্শিদকুলি কৌতুহল ভরা দৃষ্টি নিয়ে কন্যার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

—বল।

—তবে মারাঠাদের সঙ্গেই ব্যবস্থা করুন। আত্মরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই নিন্দনীয় নয়।

মুর্শিদকুলি খাঁও শেষ ব্যবস্থার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু অন্তরের মধ্যে বিরাট সাড়া পেয়ে উঠছিলেন না বলে, সঙ্কোচে যেন বার বার দোলায়িত হচ্ছিলেন তিনি।

জিন্নেতুন্নেসার মধ্যে তিনি যেন একটা সমর্থন পেলেন, বললেন. —তুই বলছিস মা ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে মারাঠাদের কাছে যাব ?

—নিশ্চয়ই, প্রয়োজন হ'লে সব করতে হবে। কিন্তু তার পূর্ব্বে সম্রাটকে আমাদের জানানো প্রয়োজন।

সম্রাটের নামে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠল মুর্শিদকুলির চোখে মুখে। বললেন. ওখানে চেষ্টা করে কোন ফল হবে কি ?

জিন্নেতুন্নেসা বললেন, ফলাফল বিচার করে লাভ নেই। আমাদের কর্তব্য হিসেবেই এখন আমাদের করতে হবে। তিনি শুনেন ভাল, না শুনেন আমাদের ব্যবস্থা আমরা করব।

—একটা নিঃশ্বাস ফেলে মুর্শিদকুলি খাঁ বললেন, বেশ তাই করব মা, তোর কথাই রাখব, একটা বিরাট সমস্যার মত হয়েছিল এ প্রশ্ন আমাকে বাঁচালি।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন।

সেই মুহূর্তে তাকে অনেকটা সুস্থ ও সবল মনে হ'ল।

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তিনি দরবারের উদ্দেশ্যে হারেমের বাইরে পা বাড়ালেন।

পিতার সেই অপস্রিয়মান মুর্তির দিকে তাকিয়ে থাকলেন জিন্নেতুন্নেসা।

ছয়

অবশেষে প্রিয়ার অনুরোধ জাহান্দারের মধ্যে চৈতন্যের সঞ্চার করেছে। দরবারে এসেছেন বাদশা।

দরবারে এসেই তিনি বুঝতে পারলেন—লালকুমারীর সন্দেহের যথার্থতা. ওম্‌রাহদের মধ্যে অনেকেই যেন আর শ্রদ্ধাশীল নয় তাঁর প্রতি।

অনেকে দরবারে অনুপস্থিত।

অনুপস্থিতের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়।

উপস্থিতদের মধ্যেও একটি চাপা গুঞ্জরন।

বিশ্বস্ত উজির জুলফিকার খাঁ।

ঔরংজীবেরও বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি।

একমাত্র তাকেই মনে হ'ল, একটু বিশ্বাস এখনো রয়েছে তাঁর।

জাহান্দার শা কাছে ডাকলেন তাঁকে, খাঁ সাহেব, অন্যান্য ওমরাহেরা কোথায়?

কেমন একটা দ্বিধা আর সঙ্কোচ ফুটে উঠল উজিরের মধ্যে! বললেন. সে কথা পরে বলব খোদাবন্দ, আবার যখন আপনাকে ফিরে পেয়েছি এবার নিশ্চয়ই সব কাহিনী যোগাতে পারব, কিন্তু দরবারে তার যোগ্য স্থান নয়। এখন আপনার অন্য কাজ রয়েছে।

ব্যাপারটা যেন কিছু আঁচ করে নিলেন বাদশা, বললেন, বলুন কি করতে হবে ?

জুলফিকার খাঁ বললেন, আপনি এই মুহূর্তে দরবারকে জানিয়ে দিন যে হারেমে থাকলেও একটা দিনও ঘুমিয়ে ছিলেন না আপনি। সমস্ত কিছুই অবহিত আছেন। মোগল সাম্রাজ্যের সংহতির জন্য পূর্বেকার অনন্ত শৌর্য্যই আপনার রয়েছে। সাম্রাজ্যরক্ষা করার জন্য তিনি নির্ম্মম ও কঠিন হতে এতটুকু ইতস্তত করবেন না।

এই যে সব আমীরদের দেখছেন অধিকাংশই একটা ষড়যন্ত্রের ফাঁকে পড়ে গিয়েছে ওরা। আপনার প্রতি বিশ্বাসের অভাবে ওদের মন এখন দোতুল্যমান। ওদের সেই পূর্ব বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য আপনাকে এইটুকু করতেই হবে।

ধৈর্য্য ধরে শুনলেন জাহান্দার শা, উজিরের পরামর্শ। বললেন, বেশ আমি এখনি আপনার কথা অনুযায়ী কাজ করছি।

বাদশা :তখনি দরবারে তার বক্তব্য বলবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ঘোষক ঘোষণা করে জানাল যে মহামান্য বাদশা এবার দরবারকে তার উপদেশ দেবেন।

সমস্ত লোক তখন উৎকর্ণ হয়ে সম্রাটকে সশ্রদ্ধ মনযোগ দেবার ভান দেখাল।

সম্রাট বললেন, আমি জাহান্দার শা। মোগলদের ন্যায়ত উত্তরাধিকারী। আমি আল্লার নির্বাচিত শাসক। আমার মধ্যে রয়েছে তৈমুর আর চিঙ্গিসের রক্ত। মোগল সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার জন্য আমি আমার সমস্ত যত্ন প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হব না। প্রয়োজন হলে শয়তানের মত নিষ্ঠুর হব। প্রয়োজনে আল্লার স্নেহ নিয়ে প্রজাবর্গের দিকে তাকাব। সুতরাং আমি মোগল বাদশা, আপনাদের জানাচ্ছি যে বিদ্রোহীকে নির্মূল ও নির্ভরকারীকে রক্ষা করব আমি। আপনারা আল্লার প্রতিনিধি মোগল বাদশা জাহান্দার শার উপর আপনাদের আস্থা রাখুন।

সম্রাট তার বক্তব্য শেষ করলেন। সমস্ত দরবার শ্রদ্ধাবনত শীরে সম্রাটের বাণীকে অনুমোদন করলো।

সম্রাট আসন গ্রহণ করলেন—কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন জুলফিকার খাঁ, বললেন, সম্রাটের বাণীকে আমরা শ্রদ্ধাবনত শীরে মেনে নিচ্ছি।

সমস্ত আমিরদের কাছ থেকেও অনুমোদন এল।

জুলফিকার আবার বললেন, এবার তাহলে প্রতাপান্বিত বাদশার সম্মুখে আমাদের দরবারের কাজ আরম্ভ হবে। আপনারা আপনাদের প্রয়োজনীয় বক্তব্য বাদশার দররারে রাখুন! আল্লার প্রতিনিধি জাহান্দার শা যথাযোগ্য বিচার করবেন। ওমরাহেরা মুহূর্তে পরস্পরে মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন, অনেক দিনের অনেক অভিযোগই যে তাদের মনের মধ্যে স্তুপাকৃত হয়ে আছে। প্রত্যেকেই তাঁরা বলতে চান।

তীব্র আবেগ যেন প্রত্যেকেরই কণ্ঠরোধ করে দিয়েছিল।

আবদ্ধ আবেগের সে এক অপূর্ব দৃশ্য ফুটে উঠল দরবারে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে কার আগমণ সঙ্কেত করে উঠল দ্বাররক্ষক।

চমকে উঠল সবাই।

কে?

ঘোষক তাঁরস্বরে চিৎকার করে ঘোষণা করল—সুবা বাংলার দূত। জাহান্দার শা আর এনায়েৎ খাঁ পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন।

জুলফিকার খাঁ বললেন; আসতে বলব?

—বলুন।

তিনি ইঙ্গিতে বাঙলার দূতকে আনবার আজ্ঞা দিলেন।

করিম খাঁ এসেছে মুর্শিদকুলির বার্তা নিয়ে।

দরবারে প্রবেশ করে তিনি নতজানু হয়ে কুর্নীস জানালেন সম্রাটকে, তারপর তার পরিচয়পত্র পেশ করলেন।

পত্র নিয়ে পাঠ করলেন জুলফিকার খাঁ।

প্রতিটি ছত্রের সঙ্গে যেন তার মুখে পরিবর্তনের ভাব ফুটে উঠতে লাগল

সমস্ত দরবার আগ্রহে তাকিয়ে থাকল তাঁর দিকে।

জাহান্দার শা জিজ্ঞেস করলেন, কি সংবাদ?

—ফর্‌রুকসিয়র আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ্‌ করেছেন বাদশা। নিজের নামে খুত্‌বা পাঠ করেছেন। বাঙলা আক্রমণ করেছিলেন তিনি রাজস্বের জন্য।

—তারপর?

—করিমবাদের মাঠে তার বাহিনী অবশ্য পরাজিত হয়েছে মুর্শিদকুলির খাঁর নিকট।

—তারপর?

জুলফিকার বললেন, মুর্শিদকুলি সন্দেহ করেছেন যে—ফর্‌রুকসিয়র আবার বাঙলা আক্রমণ করবেন। সুতরাং সম্রাটের সাহায্য তার প্রয়োজন।

বাদশা বললেন, নিশ্চয়ই। বাঙলা আক্রমণ করবার দ্বিতীয় সুযোগ তাকে দেওয়া হবে না। আমরাই তার পূর্ব্বে পাটনা আক্রমণ করব।

জুলফিকার খাঁ বললেন, সঈদ ভাইয়েরা আবদুল্লা আর হুসেন আলী ফর্‌রুকসিয়রের পক্ষে যোগদান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ বিদ্রোহের মুলে তাঁরাই।

বাদশা শুধু ছোট্ট করে জবাব দিলেন, দুষ্‌মণদের কোতল করতে হবে।

জুলফিকার বললেন, খোদাবন্দ এবার দরবারকে মুর্শিদকুলির কথা জানিয়ে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

সম্রাট তখন দক্ষিন হাত তুলে দরবারকে তার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বললেন। সমস্ত দরবার সম্রাটের দিকে ফিরে তাকাল।

বাদশা বলতে লাগলেন, এই মাত্র সংবাদ পেলাম, পূর্ব দিকে বিদ্রোহ ঘটেছে। দুষ্‌মণেরা মোগল শক্তিকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হিন্দুস্থানে মোগল শক্তি খেলার জিনিষ নয়। তার ক্ষমতা হিন্দুস্তান কেন সমস্ত দুনিয়া জয় করতে পারে। আমি জাহান্দার শা, মোগল বাদশা, ঘোষণা করছি যে এই মুহূর্তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হবে। এবং দুষ্‌মণদের কোতল করা হবে। অনুমোদনের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সমস্ত দরবার।

আবার বসল সবাই।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকল একজন।

বাঙলার দূত করিম খাঁ।

জুলফিকার খাঁ বললেন, আপনার কিছু বলবার আছে?

করিম খাঁ বললেন, খোদাবন্দ বাদশার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই। কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে যে, বাদশাকে অস্বীকার করবে!

কিন্তু আমার আরো একটি সংবাদ জানাবার আছে বাদশাকে।

আগ্রহ ভরা দৃষ্টি নিয়ে বাদশা এবং উজির উভয়েই তাকালেন করিম খাঁর দিকে।

করিম খাঁ বললেন, আমি দিল্লীর পথে আসতে আসতে জানতে পারি, একদল ওম্‌রাহ দিল্লী ছেড়ে পাটনার দিকে যাচ্ছেন ফররুকসিয়রের সঙ্গে যোগদান করতে। তারা কেউ বাদশার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। আমার অনুরোধ বাদশা অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

বাদশা ও উজির উভয়ে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

ওম্‌রাহদের মধ্যেও অনেকের চোখে ভীতি বিহ্বলতা ফুটে উঠল।

কারণ ওদের মধ্যেও অনেকে সম্রাটের বিরুদ্ধে চক্রান্তে যোগদান করেছিলেন।

জুলফিকার খাঁ সম্রাটের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি রাখলেন—

বাদশা বললেন, আপনি ঘোষণা করে দিন আমি নিজে পাটনার বিরুদ্ধে এ অভিযান পরিচালনা করব।

জুলফিকার খাঁ তৎক্ষণাৎ দরবারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, বন্ধুগণ, মহামান্য বাদশা করিম খাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। আর তিনি এইমাত্র সিদ্ধান্ত করেছেন যে পাটনার বিরুদ্ধে স্বয়ং তিনি অভিযান পরিচালনা করবেন। আপনারাও বাদশার সঙ্গে পাটনা যাবার জন্য প্রস্তুত হোন।

দুষমণকে কোতল না করে বাদশা ফিরবেন না।

তৎক্ষণাৎ দরবার বাদশার সিদ্ধান্তকে যথাযোগ্য সম্মান জ্ঞাপন করল।

বাদশা দরবার ভাঙলেন এবং নিজে হারেমে লালকুমারীর কাছে আশামহলের দিকে চললেন।

লালকুমারী তখন নতুন করে আবার রূপ বিন্যাসে মন দিয়েছিল।

আজ তার উদ্ধত যৌবনের রসে পুষ্ট দেহটি প্রস্ফুটিত গোলাপের চেয়েও সুন্দর মনে হচ্ছিল। আরো যেন আকর্ষণ ফুটে উঠেছিল তার।

কেন ?

কারণ নিজের মধ্যে নারী সত্বাকে, তার শক্তিকে, নতুন করে আবিষ্কার করতে পেরেছে আজ লালকুমারী।

বাদশা জাহান্দার শা আজ দেহ থেকে দেহাতীত প্রেমের মধ্যে পৌঁছেছেন।

যৌবনের মাংসপিণ্ড ছেড়ে বিদেহী মনের প্রতিও তার আকর্ষণ জন্মেছে।

দেহ বিলিয়ে রূপজীবি নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতে যেন আর ভাল লাগছিল না লালকুমারীর।

দেহকে অতিক্রম করে কোথায় যেন একটা হাহাকার ছিল তার।

বাদশা শুধু তার দেহের মোহে উন্মাদ হয়ে থাকুক, ঠিক এটা যেন আর চায়নি সে।

কিছুদিন থেকেই রূপসী থেকে প্রেয়সী হবার সাধ জেগেছিল লালকুমারীর মনে।

আজ বাদশা তাকে প্রেয়সী বলে গ্রহণ করেছেন

বাদশা জাহান্দার শা' তার দেহকে অতিক্রম করে মনেরও সম্মান দিয়েছেন।

বহুদিন পরে দরবারে গিয়েছেন তিনি।

লালকুমারীর দেহের আকর্ষণ ত্যাগ করে মনস্তুষ্টির জন্যই তিনি আজ দরবার করেছেন।

নারী জীবনের এ এক গৌরব।

দেহ থেকে নারী যখন মনে স্থান পায় তখন সে রমণী থেকে নারী হয়, বাঈজী থেকে গৃহিণী হয়।

সেই নারীর, সেই গৃহিণীর মর্যাদা পেয়েছে লালকুমারী

তাই আজ তার আনন্দ।

আজ তাই মনের মধ্যে তার উদ্বেলভাব।

সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে সেই চাপা উত্তেজনা যেন পথ খুঁজছে।

চেতনা মথিত করে তাই আনন্দ কয়েকটি গানের কলিতে যেন গুন গুন করে প্রকাশ ভিক্ষা করছে।

সুরের আবেগে স্পন্দিত লালকুমারী তাই বার বার নিজেকে তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে।

দেখছে তার দেহে নতুন কোন চিহ্ন ফুটে উঠছে কিনা।

নতুন কোন লক্ষণ রূপসীকে অতিক্রম করে গৃহিণী করেছে কিনা তাকে।

এক তন্ময় ভাব তার।

সেই তন্ময়তার মধ্যে যখন সে ডুবেছিল—হঠাৎ দর্পণে কার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল।

বাদশা জাহান্দার শা।

একদৃষ্টে তিনি লালকুমারীর প্রস্ফুটিত যৌবনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একটা লুব্ধ ভ্রমরের মত মনে হচ্ছিল তাকে।

লালকুমারী ফিরে তাকাল বাদশার দিকে।

বাদশা গভীর দৃষ্টিতে তার চোখে চোখ রাখলেন।

সে চোখে কিসের যেন একটু বেদনা।

লালকুমারী এগিয়ে আসল বাদশার কাছে।

বাদশা আজ তাকে লুব্ধ যৌবনের নয়, স্নিগ্ধ প্রেমের দুটি বাহু বাড়িয়ে আকর্ষণ করলেন।

সেই আকর্ষণের মধুর স্পর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করলো লাল। বাদশা তাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন।

লালকুমারী কিসের একটা সিক্ততা নিজের মধ্যে অনুভব করলো। সে আধো আধো করে জাহান্দার শা'কে বলল, আমার উপর রাগ করেছেন খোদাবন্দ?

—কেন?

—আমি আপনাকে জোর করে দরবারে পাঠিয়েছি বলে?

বাদশা বললেন, না, তোমার উপর আমি সন্তুষ্টই হয়েছি লাল। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। দেহ সুখের মধ্যে আমাকে ভুলিয়ে রাখলেই বরং তুমি অন্যায় করতে। সেখানে তুমি বাঈজীর পরিচয় দিতে, আজ তুমি প্রেয়সীর কাজ করেছ।

আনন্দে লালকুমারী যেন কোন কথা বলতে পারল না। শুধু চোখ বুজে নতুন জীবনকে উপভোগ করবার চেষ্টা করল।

বাদশা বললেন, উপযুক্ত মুহূর্তে তুমি আমাকে চেতনা দিয়েছ। আজ দরবারে না গেলে সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল।

রাজকার্য্যে অবহেলা এ কয়দিন আমার নিশ্চয় অন্যায় হয়েছে।

আমার অনুপস্থিতিতে দেশ অরাজক হয়েছে। বিদ্রোহের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

তুষ্‌মণরা বিহারে বিদ্রোহও করেছে।

বিদ্রোহ!

কথাটা শুনে কেমন যেন চমকে উঠল লালকুমারী।

তাহলে সর্বনাশ ঘটে গিয়েছে!

বিদ্রোহের স্বরূপ জানবার জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল সে।

বলল, কি হয়েছে খোদাবন্দ?

বাদশা বললেন, ফররুকসিয়র পাটনাতে নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করেছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে হুসেন আলী আর আব-দুল্লা। বাঙলার দিকে অভিযান পাঠিয়েছিল ওরা।

—বটে! তারপর?

—মুর্শিদকুলি খাঁ তাদের পরাজিত করেছেন। কিন্তু তুষমণরা আবার তাকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

একটু যেন সচকিত হ'ল লালকুমারী, বলল, মুর্শিদকুলি খাঁ কি করবেন ঠিক করেছেন?

—তিনি আমার সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।

—আপনি কি ঠিক করেছেন জাহাপনা?

—আমি যাব। নিজে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করব। তুষমণদের দেখিয়ে দিতে চাই যে জাহান্দার শা প্রেমিক হলেও তুকি আর মোগল রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত। সাম্রাজ্য রক্ষা করতে সে জানে। এমন শাস্তি আমি ওদের দেব, যা শয়তানও কল্পনা করতে শিউরে উঠবে।

প্রেমিক জাহান্দার শা, নারী বিলাসী জাহান্দার শা'র মধ্যে আজকে যেন নতুন রূপ দেখতে পেল লালকুমারী।

চাপা আক্রোষ তার সমস্ত দেহের মধ্যে একটা শৌর্য্যের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলেছে যেন।

আদিম পুরুষকে যেন এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে লালকুমারী।

ভালবেসে সে জাহান্দার শার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

জাহান্দার শা তার সেই আবেগমুগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে—ডাকলেন, লাল।

—বলুন বাদশা ?

—তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে কয়দিন।

—কেন জাহাপনা ?

—আমি যে নিজে যুদ্ধে যাব।

লালকুমারী বলল, দূরে গেলেই কি ছেড়ে যাওয়া হয় ? দূরই যে আরো নিকট করে। দেহের সান্নিধ্যের চেয়ে আকাঙ্খার পাওয়াই যে বড় জাহাপনা। আমি কি আপনার আকাঙ্খার জগৎ থেকে দূরে চলে যাব ?

আর একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে লালকুমারীকে বাদশা নিজের কাছে টেনে নিলেন। না লাল, তুমি আমার আজন্ম মানস সঙ্গিনী।

—তবে দূরে যেতে ভয় কেন ? জেনে রাখুন জাহাপনা লালকুমারী নর্তকী হলেও নারী। আপনি তাকে ভাল বেসেছেন ? ভালবাসার মর্য্যাদা দিতে সেও জানে। নিকটে দূরে, জীবনে মরণে, লালকুমারী চিরদিন আপনার কাছেই থাকবে।

বাদশা যেন আজ নতুন করে লালকুমারীকে আবিষ্কার করলেন। কিছুক্ষণ তাই মুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকলেন লালকুমারীর দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আর আমার ভয় নেই লাল। আজ আমার মৃত্যুতেও ভয় নেই।

লালকুমারী বাদশাকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরল।

সেই মুহূর্তে পাটনা প্রাসাদেও আর এক প্রণয়ের লীলা চলছিল। বাঙলার বিরুদ্ধে ইব্রাহিমকে প্রেরণ করে চিন্তান্বিত ফররুকসিয়র এসেছিলেন প্রাসাদে তার প্রেয়সীর কাছে।

ফারুকউন্নিসা তখন পাটনার আকাশে সন্ধ্যার ধীর আগমন লক্ষ্য করছিল।

কমনীয় সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আবেষ্টন মনের মধ্যে কেমন শিশির সিক্ত ভাব জাগিয়ে তুলছিল।

বিষাদের মাধুর্য্যে কোমল এক পরম জিজ্ঞাসা নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

মানুষ এত নিষ্ঠুর কেন?

বাঁচবার জন্য যদি পশুবৃত্তিই অবলম্বন করতে হয়, তবে সে মানুষ কিসে?

পশু থেকে মানুষের পার্থক্য কোথায়?

পশু থেকে মানুষের পার্থক্য প্রেমে।

যে মানুষ প্রেম উপভোগ করতে পারে না, সে মানুষ মানুষ নয়।

মানব জীবন তার ব্যর্থ।

ভাবছিল সে ফররুকসিয়রের কথাই।

বেশ তো ভাল ছিল তারা।

বিহঙ্গ মিথুনের মত দুটি প্রণয় প্রণয়ী ভালবাসার সুখে জীবন কাটাচ্ছিল।

হঠাৎ তবে এ উচ্চাকাঙ্খার ঝড় কেন?

কেনই বা জীবনকে বঞ্চনা করে উচ্চাকাঙ্খার পেছনে মানুষের নেশা।

এইসব প্রশ্নে নিজেকেই বিপর্য্যস্ত করছিল ফারুকউন্নিসা। ঠিক সেই সময় শাহজাদা ফররুকসিয়র ক্লান্ত ভাবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তার পাশে?

পদশব্দে ফিরে তাকিয়েছিল ফারুকউন্নিসা।

দেখেছিল শাহজাদা বিমর্ষ ভাবে যেন দাঁড়িয়ে আছেন।

তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত প্রশ্নকে দূরে রেখে সে চলে এসেছিল শাহজাদার কাছে।

মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আপনাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন শাহজাদা ?

হতাশ ভঙ্গিতে বলেছিলেন ফর্‌রুকসিয়র, এই মুহূর্তে বাঙলা থেকে দুঃসংবাদ এসেছে ফারুক।

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সে, কি দুঃসংবাদ শাহজাদা ?

—বাঙলাতে আমার প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। তিমুর বেগ নিহত হয়েছে।

সমবেদনার একটা দৃষ্টি নিয়ে ফারুক স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। যদিও স্বামীর যুদ্ধবাজ উচ্চাকাঙ্খাকে সে সমর্থন করে না, তবু সেই মুহূর্তে সমস্ত প্রশ্নের অতীত, স্বামীই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। সান্ত্বনা দেওয়া কর্তব্য বোধ হ'ল তার। বলল, তাতে ভেঙ্গে পড়বার কি হয়েছে শাহজাদা। ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই সার্থকতা আসবে।

ফর্‌রুকসিয়র ধীরে ধীরে বললেন, কি জানি !

কথার মধ্যে ফারুক মুহূর্তে কিসের যেন ইঙ্গিত পেল। অমনি বলল, তাহলে আপনি এসব ত্যাগ করুন শাহজাদা, চলুন আমরা জাহান্দার শার কাছে ক্ষমা ভিক্ষে করি, তাতে আমাদের অপমান হবে না।

একটা প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকাল সে ফর্‌রুকসিয়রের দিকে।

কিন্তু, না।

শাহজাদা সে রকম কোন ভাব দেখালেন না। বললেন, না ক্ষমা প্রর্থনা অসম্ভব। যা হবার তা হয়েছে। ভুল হলেও এখন এই ভুল নিয়েই চলতে হবে।

ব্যথা পেল ফারুক, স্বামীর মুখের দিকে বেদনার্ত ভঙ্গিতে তাকাল সে। তারপর বলল, তাহলে কি করবেন ?

ফর্‌রুকসিয়র বললেন, আবার অভিযান পাঠিয়েছি বাঙলায় ইব্রাহিম খাঁর অধীনে।

ফর্‌রুকসিয়রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ফারুক। কিছু বলল না। তার সেই নীরবতার মধ্যে কিসের একটা আর্তভাব যেন ফুটে উঠল।

ফর্‌রুকসিয়র বললেন, ভয় নেই। ভয় নেই, এবার আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

কিছু বলল না ফারুক তবু।

শুধু মনে মনে ভাবল—আমার ভয় যে কি সেকি আপনি বুঝবেন শাহ্‌জাদা। যুদ্ধ জয়ই যে আমার ভয়। সাম্রাজ্য যে প্রেমকে দূরে সরিয়ে দেবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিহারে সুকরীগোলি ঘাটের কাছে আর এক দৃশ্যের অবতারণা হ'ল।

মুর্শিদাবাদের পথে পাটনা বাহিনীকে বাধা দিয়ে দাঁড়াল বাঙলার সেনাবাহিনী।

মুর্শিদকুলির সিপাহীশালার জনাবৎ খাঁ। ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, বাঙলার দিকে সৈন্য পাঠান হচ্ছে কেন?

উদ্ধত উত্তর এল ইব্রাহিম খাঁর বিদ্রোহী সুবেদারকে শাস্তি দেবার জন্য।

প্রশ্ন করে পাঠালেন জনাবৎ খাঁ, বিদ্রোহী কে? মুর্শিদকুলি খাঁ না ফর্‌রুকসিয়র। বাদশা কে? কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন বাঙলার সুবেদার? ইব্রাহিম উত্তর দিলেন, বাদশা ফর্‌রুকসিয়র।

—কি করে?

তরবারি দেখিয়েছিলেন ইব্রাহিম খাঁ, বললেন এর জোরে।

নিজের তরবারি দেখিয়ে উত্তর দিলেন জনাবৎ খাঁ, এর জোরে আমিও ফর্‌রুকসিয়রকে বাদশা বলে মানতে রাজি নই। আর বাক্যব্যয় না করে ইব্রাহিম খাঁ তখন বঙ্গবাহিনীকে আক্রমণ করবার নির্দেশ দিলেন।

প্রচণ্ড বিক্রমে পাটনার সৈন্যরা আক্রমণ করল। কিন্তু সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী পথ এমন ভাবে অবরোধ করে দাড়িয়েছিল বঙ্গবাহিনী যে তা ভেদ করে যাওয়া প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল বললেই হয়।

সুকরীগোলি।

তার পশ্চিম পার্শ্বে রাজমহল পাহাড় আর পূব পাশে গঙ্গা।

মাঝখানে হাত ত্রিশেক সরু পথ।

সেই পথ অবরোধ করে দাড়িয়েছে জনাবৎ খাঁ।

তাকে ভেদ করে যাওয়া অসম্ভব মনে হ'ল ইব্রাহিমের।

একমাত্র উপায় ছিল গঙ্গার উপর দিয়ে নৌবহর নিয়ে যাওয়া। ইব্রাহিম খাঁ যখন দেখলেন স্থলপথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব তখন নৌববাহিনীর কথা লিখে পাঠালেন ফররুকসিয়রকে।

পাটনা দরবারকে চমকিত করে তখন নতুন এক সংবাদ বিপর্য্যয়ের মত এসে পৌছেছিল ফর্‌রুকসিয়রের কাছে। দরবারে বসেছেন ফর্‌রুকসিয়র। তার দক্ষিণ পাশে আবদুল্লা আর বাম পাশে হুসেন আলী।

বাঙলার দ্বিতীয় অভিযানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই হয় তো তারা ভাবতে বসেছিলেন।

কিন্তু বাঙলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার পূর্ব্বেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত দিল্লীর সংবাদ এসে পৌছল তাঁদের কাছে।

সংবাদ পেলেন ফর্‌রুকসিয়র যে পাটনাগামী একদল ফর্‌রুকসিয়র সমর্থক ওম্‌রাহকে পথে আটক করেছেন জাহান্দার শা।

সমস্ত চক্রান্ত ধরা পরে গেছে।

আর বাঙলার কথা ভাববার সময় যেন থাকল না।

কি করা যাবে সেই নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ ইব্রাহিম খাঁর বার্তা এসে পৌছুল দরবারে। নিতান্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে হুসেন আলী শুধালেন, কি সংবাদ?

দূত উত্তর দিল, সুকরীগোলির কাছে আমাদের গতিরোধ করেছেন জনাবৎ খাঁ। স্থলপথে বাঙলার দিকে অগ্রসর হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

ইব্রাহিম খাঁ আরো সৈন্য আর নৌবহর চেয়ে পাঠিয়েছেন।

ইব্রাহিম খাঁর চিঠি দরবারে পেশ করল সে।

ফর্‌রুকসিয়র যেন ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলেন।

হঠাৎ অতর্কিতে দুদিক থেকে এমন বিপদ ঘনিয়ে আসবে এটা যেন তিনি ভাবতেও পারেননি।

অসহায়ভাবে সঈদ ভাইদের দিকে তাকালেন তিনি।

আশ্বাস দিলেন হুসেন খাঁ, ভয় পাবেন না খোদাবন্দ। আমরা যখন আপনার পক্ষে আছি, জয় আপনার নিশ্চিত।

—বাঙলার ব্যবস্থা কি করবেন? জিজ্ঞেস করলেন ফর্‌রুকসিয়র।

হুসেন আলী বললেন, আপাতত বাঙলার আশা ত্যাগ করতে হবে। আরো বড় প্রয়োজন এখন আমাদের দিল্লীতে।

—তাহলে কি করব আমরা?

হুসেন আলী বললেন, আপনি এই মুহূর্তে ইব্রাহিমকে পাটনা ফিরে আসতে আদেশ দিন। সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে আমাদের দিল্লীর দিকে অগ্রসর হতে হবে।

দরবারে সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হোল।

ফর্‌রুকসিয়রের নামাঙ্কিত পাঞ্জা নিয়ে দূত তৎক্ষণাৎ সুকরী-গোলির দিকে ছুটে গেল।

পাটনাতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

সঈদ ভাইয়েরা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে বাহিনী-গঠন করতে লেগে গেলেন।

জাহান্দার শার বিরুদ্ধে এ শুধু ফর্‌রুকসিয়রের অভিযান নয়। দুর্বলের বিরুদ্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভিযানও এটা।

মোগল সাম্রাজ্যকে হাতের মুঠোয় নিয়ে পুতুলের মত খেলাতে চান সঈদ ভাইয়েরা।

রাজনীতির জুয়া খেলায় এবার তাদের ভাগ্য পরীক্ষা।

সুতরাং যথা ক্ষমতা দিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে লেগে গেলেন আবদুল্লা আর হুসেন আলী।

প্রস্তুতি সমাপ্ত হ'ল। ইব্রাহিম খাঁ ফিরে আসলেন।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৭১২ খৃষ্টাব্দ।

ফররুকসিয়র আর সঈদ ভাইয়েরা পাটনা ত্যাগ করলেন দিল্লীর পথে।

সাত

রক্ত কলঙ্কিত দিল্লীর সিংহাসন।

যুগে যুগে রক্তস্নানের পুরস্কারে সে বাদশা জাদাদের আয়ত্বাধীনে এসেছে।

দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে হলে রক্তের তর্পণ চাই।

আকবর থেকে জাহান্দার শা' সবাই রক্তের আলপনা এঁকে এসেছিলেন দিল্লীর মসনদে।

আবার রক্তের আলপনা আঁকলেন ফররুকসিয়র।

জাহান্দার শা তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

প্রণয়ের জন্য প্রজাপুঞ্জ আর সাম্রাজ্যকে অবহেলা করেছিলেন তিনি।

সাম্রাজ্য নিদারুণ প্রতিশোধ নিল।

ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হলেন জাহান্দার শা।

প্রণয়ের মধ্যে তরুণ প্রেমের যে ফুলটি ফুটে উঠেছিল ধীরে ধীরে অকালে তা ঝরে গেল।

জাহান্দার আর লালকুমারীর গল্প অসমাপ্ত থেকে গেল।

প্রেমের স্বপ্ন মন্দিরের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই মাঠে ঝরে গেল।

হাওয়ায় হারিয়ে গেল লালকুমারী।

কোথায় গেল জানল না কেউ।

এক যুগল প্রেমকে হত্যা করে আর এক প্রণয়ী যুগল লালকেল্লায় প্রবেশ করলেন তারুণ্যের নতুন স্বপ্ন নিয়ে।

জাহান্দার শা আর লালকুমারীর গল্প শেষ হ'ল। কিন্তু ফর্রুকসিয়র আর ফারুকউন্নিসা এলেন নতুন কাহিনী রচনা করতে।

কিন্তু নিহত প্রেম বুঝি প্রেতাত্মার অভিশাপ নিয়ে একটা অপছায়ার মত প্রবেশ করলো দিল্লী প্রাসাদে।

১৭১৩ খৃষ্টাব্দ।

ফেব্রুয়ারী মাস।

দেওয়ানী আমে সিংহাসনে বসলেন ফর্রুকসিয়র।

দিল্লী তার—যে জয় করে নিতে পারে।

দিল্লীর ওমরাহেরা যুগে যুগে বিজয়ীকেই বরমাল্য অর্পণ করেছে।

আজো তাই দলে দলে ওমরাহেরা ভীড় করে দেওয়ানী-আমে।

অনেকদিন পর আবার দেওয়ানী-আম ঝলমল করে উঠছে।

উপঢৌকন এনেছে দেশী আমিরেরা।

উপহার নিয়ে এসেছে বিদেশী রাষ্ট্র দূতেরা।

নতুন বাদশার স্মরণাকাঙ্ক্ষী আবার তারা।

ব্যক্তিত্বের এই অহংসৌধে বসে আছেন নতুন বাদশা। তরুণ ফর্রুকসিয়র।

ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন তার চোখের সামনে।

ঠিক ততটা সুখী যেন মনে হচ্ছে না তাকে।

কেন?

কারণ তরুণ বাদশা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে ওমরাহদের এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্যে কোথায় যেন একটু ফাঁক রয়ে গেছে।

সবটুকুই আন্তরিকতায় পূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না যেন তার।

সবার দৃষ্টিও যেন ঠিক তার দিকে নিবদ্ধ নয়।

বাদশার বাইরেও যেন কে এক শক্তি এই দরবারে রয়েছে।

বাদশাকে উপলক্ষ্য করে সেই লক্ষ্যের দিকেই যেন সব ধাবমান।

সঈদ ভাইদের দিকেই যেন সকলের দৃষ্টি।

এবং আবদুল্লা আর হুসেন আলীর ভাবখানাও এই যে তারাই সব। বাদশা তো তাদের অনুকম্পার পাত্র।

তাহলে এই কি দিল্লীর সিংহাসন?

এই কি বাদশার ক্ষমতা?

এমনি সঙ সেজেই কি তবে এতকাল অন্যান্য বাদশারা রাজত্ব করে গেছেন?

নিজেকে যেন বঞ্চিত আর অসহায় বোধ হ'তে লাগল ফররুক-সিয়রের। আত্মপ্রসারী ব্যক্তিত্ব তার।

তৎক্ষণাৎ সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠল তার মন।

না, ঠিক হাতের পুতুল হ'য়ে ফররুকসিয়র থাকতে পারবেন না।

তিমুর আর চিঙ্গিস খাঁর রক্ত রয়েছে তার মধ্যে।

কারো ক্রীড়নক হওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

অদূর ভবিষ্যতেই প্রাধান্যের জন্য যে আবার সংগ্রাম হবে এটা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন ফররুকসিয়র।

তাই তিনি কিঞ্চিৎ বিমর্ষ।

কিন্তু বিমর্ষ হ'লেও যথাসাধ্য তা গোপন করে চলবার চেষ্টা করলেন। সঈদ ভাইয়েরা হয়তো লক্ষ্য করলেন না তা। কিন্তু তা লক্ষ্য করলেন, অশীতিপর বয়স্ক এক বৃদ্ধ—এনায়েৎ খাঁ।

দরবার ভাঙলে—বাদশা উঠে দাড়ালেন।

সঈদ ভাইয়েরা শিবিকায় বাদশাকে এগিয়ে দিলেন।

আমিরাহর উঠে সম্মান জানাল।

বাদশার শিবিকা ছেড়ে দিল।

সঈদ ভাইয়েরা অন্যান্য আমিরদের সঙ্গে নিজেদের আস্তানার দিকে চললেন।

কিন্তু অশ্বারোহী এনায়েৎ খাঁ শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর এগিয়ে গেলেন। শিবিকার ফাঁকে ফর্রুকসিয়র লক্ষ্য করলেন তাকে।

হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকলেন।

অশ্বপৃষ্ঠ থেকেই সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানালেন এনায়েৎ।

এনায়েৎ খাঁকে ফর্রুকসিয়র ভাল করেই চেনেন।

ঔরংজীবের ডান হাত ছিলেন এনায়েৎ খাঁ।

কাছে এলে বাদশা বললেন, জনাব অনেকটা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

একটু হেসে বললেন এনায়েৎ, বয়েসকে তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না খোদাবন্দ।

—ফর্রুকসিয়র অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন,—এদিকে কোথায় চলেছেন ?

—আপনার সঙ্গেই একটু চলেছিলাম খোদাবন্দ।

—কিছু বলবেন ?

—যদি মাপ করেন···একটু ইতস্তত করলেন এনায়েৎ খাঁ।

—আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন।

—জাহাপনাকে যেন দরবারে তেমন প্রফুল্ল মনে হল না ?

ফররুকসিয়র একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখলেন বৃদ্ধকে।

আজ তার একজন অবলম্বনের প্রয়োজন।

এনায়েৎ খাঁকে দিয়ে চলবে কি ?

তিনি খুঁটে খুঁটে বিচার করে দেখতে লাগলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিলেন না তার প্রশ্নের।

এনায়েৎও দেখছিলেন ফর্রুকসিয়রকে।

তাঁর অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝতে পারলেন যে ফর্রুকসিয়র তখনো সন্দেহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

দ্বিতীয়বার সে প্রশ্ন তিনি করলেন না। শুধু বললেন, জাহাপনা, আমি আলমগীরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলাম।

—জানি জনাব।

—আপনি তারি বংশধর। আপনার প্রতিও আমার আনুগত্য তেমনি আছে জানবেন।

শিবিকা চলতে লাগল। অশ্বও কিছুদূর পাশে পাশে চলল।

ফর্‌রুকসিয়র শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না তৎক্ষণাৎ।

বিদায় নেবার পালা এল এনায়েতের। বললেন, এবার আমায় যেতে হবে খোদাবন্দ। প্রয়োজন হলে এ বান্দাকে তলব করবেন। আমি সব সময় আপনার হুকুম তামিল করবার জন্য আছি জানবেন।

গম্ভীরভাবে ফর্‌রুকসিয়র বললেন, আচ্ছা।

সামরিক কায়দায় অভিনন্দন করে চলে গেলেন এনায়েৎ খাঁ।

কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থাকলেন বাদশা। তারপর আবার কি একটা চিন্তায় ডুবে গেলেন যেন।

শিবিকা হারেমের দিকে এগিয়ে চলল।

হারেমে ঠিক অনুরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল।

ফারুকউন্নিসা বাদশা পত্নী, প্রধান বেগম হয়ে এসেছেন।

তাকে সম্মান জানাবার জন্যও জেনানা মহলে ভীড় জমেছে তেমনি!

এসেছে আমিরদের বিবি, বেগম।

আবদুল্লা খানেরই আশীজন বিবি এসেছেন।

হুসেন আলীর বেগমরাও এসেছেন।

জড় হয়েছে দিল্লী প্রাসাদের অবহেলিত পূর্ববর্তী বেগমেরা।

এসেছে বাঁদীরা।

আবার প্রাণ চাঞ্চল্য ফুটেছে জেনানা মহলে।

কিন্তু ফারুকউন্নিসাকে যেন সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে না।

কারণ এ সম্মানের মধ্যে কোথায় যেন একটু ঔদ্ধত্যের সুর রয়েছে।

সেই গম্ভীর পরিবেশে প্রধানা বেগমকে অভিনন্দন জানান হচ্ছে না।

চতুর্দিকে এক গোলমাল!

কেমন যেন রীতিবিহীন।

বিশেষ করে উশৃঙ্খল আবদুল্লা আর হুসেন আলীর হারেমের বেগমেরা।

তাদের সে ব্যবহার ভাল লাগেনি ফারুকউন্নিসার।

কোন রকমে সৌজন্য বজায় রেখে সে পালিয়ে এসেছে।

পালিয়ে এসেছে জাহান্দার শা'র প্রমোদ কক্ষ আর্শীমহলের নির্জন প্রকোষ্ঠে।

এখানে কিসের এক স্নিগ্ধ ছায়া আছে যেন।

ভাল লাগল ফারুকউন্নিসার।

আর্শীমহল যেন জীবনের উন্মাদ কোলাহলের বাইরে কবির ধ্যানের জগৎ।

সমস্ত মহলটাই যেন জাগ্রত শিল্প।

এখানে আসলে আকাঙ্ক্ষা নয়, উন্মাদনা নয়, কিসের একটা নিথর শান্তি ঘিরে ধরতে চায়।

ভাল লাগে। ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

ভাল লাগবেই, কারণ এ মহল জাহান্দার আর লালকুমারীর স্বপ্ন দিয়ে গড়া।

এখানেই যে তারা তাদের ভালবাসার স্বর্গ নির্মাণ করেছিলেন।

হঠাৎ সে কথা মনে পড়তেই নিজের মধ্যে কেমন একটা বিষাদ অনুভব করেন ফারুকউন্নিসা।

দেওয়ালের চতুর্দিকে আর্শীগুলির স্বচ্ছতায় কিসের একটা সাড়া পান যেন তিনি।

কার নীরব সান্নিধ্য যেন অনুভূত হয়।

কার ?

মনে হয়, অতৃপ্ত লালকুমারীর নীরব চোখ যেন তখনো দেয়ালে লেগে রয়েছে।

তবে এই কি প্রেমের পরিণতি ?

এই কি বাদশার সুখ ?

ভেবে কেমন আরো ম্রিয়মান হয়ে যায় ফারুকউন্নিসা।

অথচ তবুও কেমন যেন ভাললাগে আর্শীমহল।

সমস্ত প্রাসাদে একমাত্র আর্শীমহলেই যেন কিসের একটা স্নিগ্ধতা আছে।

এ স্নিগ্ধতা প্রেমের।

কিন্তু সাম্রাজ্যের সঙ্গে এ প্রেমের কোন সঙ্গতি নেই।

আর্শীমহল তাই মোগল হারেমে বেমানান।

আর্শীমহলকে ভালবেসেছিলেন বলেই জাহান্দার শার পতন।

আর্শীমহল অলস করে, বিলাসী করে, কল্পনা প্রবণ করে।

আর্শীমহল সম্রাট প্রণয়ের প্রতি দারুণ বিদ্রূপ।

এমনি সব সহস্র অসঙ্গত কথা মনে আসছিল ফারুকউন্নিসার। আর সেই মুহূর্তে কান্না পাচ্ছিল তার।

এর চেয়ে পাটনা. এর চেয়ে পদমর্যাদার ক্ষুদ্রতা ছিল অনেক ভাল।

সেখানে প্রেম ছিল।

সেখানে ভালবাসার অবসর ছিল।

জীবনকে যেন পশ্চাতে বিসর্জন দিয়ে এসেছে ফারুকউন্নিসা।

এখন শুধু কৃত্রিম ঔজ্জ্বল্য।

এখন শুধু ষড়যন্ত্র।

এখন শুধু মিথ্যে আভিজাত্য।

সুখের নীড় ছেড়ে কণ্টক শয্যা।

সেই মুহূর্তে ফর্রুকসিয়রও বিষণ্ণ কল্পনায় কেন যেন আশী মহলের দিকেই আসছিলেন।

এক মুহূর্তেই সাম্রাজ্যের মুখোস ধরা পড়ে গেছে তার কাছে।

হাঁপিয়ে উঠেছেন তিনি।

এই তার সাম্রাজ্য !

এরই জন্য এত প্রচেষ্টা !

কি পেলেন তিনি ?

হারালেনই বা কি ?

শান্তি হারিয়েছেন ফর্রুকসিয়র।

সেই মুহূর্তে জাহান্দার শার করুণ চোখ দুটি ভেসে উঠল তার মনের মধ্যে।

কি এক প্রেমের স্নিগ্ধতায় তা' পরিপূর্ণ ছিল।

হত্যার পূর্ব মুহূর্তেও তার পরিবর্তন হয় নি।

জাহান্দার শা'র কেন পতন হল ?

তার চরিত্র তার পতন ঘটিয়েছে।

তার প্রেম তার পতনের কারণ হয়েছে।

কিন্তু জীবন হারিয়ে জাহান্দার শা' কি সত্যি হেরে গেছেন ?

না, হারেন নি।

তাঁরই জয় হয়েছে।

এই অসঙ্গতির উর্দ্ধে উঠেছেন তিনি।

হয়তো সেখানে লালকুমারীর সঙ্গে তার অনন্ত মিলন্ হয়েছে।

'লালকুমারী' কথাটা মনে পড়তেই কেমন একটা বেদনা অনুভব করলেন তিনি।

হয়তো একটি প্রেমের ফুলকে তিনি অকালে বৃন্তচ্যুত করেছেন।

মনে মনে আল্লার কাছে প্রার্থনা করলেন ফর্রুকসিয়র, ওদের শান্তি হোক।

সেই মুহূর্তে আশীমহলের কথা মনে পড়ল তাঁর।

জাহান্দার আর লালকুমারীর প্রেমের লীলাক্ষেত্র আর্শীমহল।

মনে হ'ল হারেমে প্রবেশের পূর্বে সেই প্রেম-তীর্থে তিনি পরলোকগত আত্মা দুটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবেন।

সেই প্রেমের নিকুঞ্জ কেমন, দুচোখে একবার দেখে যাবেন তিনি।

ফলে শিবিকা বাহকদের বললেন তিনি, আর্শীমহল চল।

দেখতে দেখতে আর্শীমহলে এলেন তিনি।

তার আঙ্গিনাতেও যেন কিসের একটা স্নিগ্ধতা আছে।

গভীর তন্ময়তার সঙ্গে সেই দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুকাল ফর্‌রুকসিয়র।

তারপর সিঁড়ি বেয়ে মহলের ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলেন।

সেই পরিত্যক্ত প্রাসাদের বিরহের মধ্যে তখন ফারুকউন্নিসাও ভেবে চলেছিল নিজের জীবনের কথা।

আর্শীমহলের মধ্যে সেও তন্ময় হয়েছিল আপন কল্পনায়।

ফর্‌রুকসিয়রও স্বপ্ন বিভোর হয়ে যেন আসছিলেন সেখানে।

সেই মুহূর্তে আর্শীমহলের মধ্যে অন্য কেউ থাকতে পারে, কল্পনাও করতে পারেন নি তিনি।

এই নির্জন প্রকোষ্ঠে এক নারী মূর্তির নিঃসঙ্গ উপস্থিতি তাই কেমন চমকে দিয়েছিল তাকে।

কে!

লালকুমারী!

প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলেন ফর্‌রুকসিয়র।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফিরে তাকিয়ে ছিল ফারুকউন্নিসা।

অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন তার দিকে নতুন বাদশা,—তুমি!

ফারুকউন্নিসার চোখেও একই প্রশ্ন, আপনি!

তরুণ বাদশা বললেন, প্রায়শ্চিত্ত করতে এলাম।

সুমধুর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ফারুকউন্নিসা, কিসের প্রায়শ্চিত্ত জাহাপনা?

—হত্যার। ভালবাসা হত্যার প্রায়শ্চিত্ত।

করুণ দৃষ্টি মেলে শুধু স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিল ফারুকউন্নিসা।

তরুণ বাদশা বলেছিলেন, কেমন মনে হয় আশীমহল তোমার?

—পাখীর নীড়ের মত জাহাপনা।

—ঠিক বলেছ। মানুষের নীড়ে এত শান্তির স্পর্শ থাকতে পারে না।

আবার প্রশ্ন করেছিলেন ফর্‌রুকসিয়র, কিন্তু কি আছে এখানে, বলত, যা এমন স্নিগ্ধ করে গড়ে তুলেছে আশীমহলকে?

—প্রেম। ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছিল ফারুকউন্নিসা।

বাদশা মুগ্ধভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখেছিলেন তাকে।

ধীরে ধীরে আবেগভরে ডেকেছিলেন তিনি, ফারুক।

—আদেশ করুন জাহাপনা।

—এস আমরা এখানেই থাকি।

প্রস্তাবটি শুনেই যেন কেমন চমকে উঠেছিল ফারুকউন্নিসা।

অসহায়ভাবে তাকিয়েছিল স্বামীর মুখের দিকে।

সেই অসহায় অবস্থা দেখে নিজেও কেমন অবাক হয়েছিলেন বাদশা! বলেছিলেন, কেন, ভাল লাগল না প্রস্তাবটি? এস, এখানে আমরা থাকি! জাহান্দার শা আর লালকুমারীর প্রেমকে সার্থক পরিণতি দিই আমরা!

স্বামীর সেই মুগ্ধ বিস্ময়ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল শুধু ফারুক, কোন কথা বলল না সে।

বাদশাই আবার বললেন, এস এখানেই থাকি আমরা। প্রত্যহ স্বর্গত প্রণয়ী যুগলকে এখান থেকে শ্রদ্ধা জানাব আমরা। আর বলব, ক্ষমা কর আমাদের। সুখী হও।

হঠাৎ স্বামীর হাত দুটো প্রবল বেগে চেপে ধরল ফারুকউন্নিসা।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়ভাবে বলল, না।

অবাক হলেন বাদশা, না কেন? তুমিই তো পাটনা প্রাসাদে

কতদিন আমায় বলেছ'—সাম্রাজ্য প্রেমকে ছোট করে। এস আমরা সে ভুল ভেঙ্গে দিই।

চিৎকার করে উঠল যেন ফারুকউন্নিসা—না, না জাহাপনা তা হয় না। প্রেম সম্রাটের শত্রু।

—একি বলছ তুমি।

—হ্যা জাহাপনা আমি ঠিকই বলছি।

সে এবার হাত ধরে টানল বাদশার। বলল, চলুন প্রাসাদে।

—কেন?

—লালকুমারীর এ প্রাসাদে অভিশাপ আপনাকে স্পর্শ করবে। আপনি চলুন। প্রেমের জন্য আমার স্বামীকে হারাতে পারি না। কিছু যেন বুঝতে পারলেন না ফররুকসিয়র, আশ্চর্য হয়ে বেগমের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

আট

ঔরংজীব মোগল সাম্রাজ্যের জন্য কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন।

তার মৃত্যুর পরেও সেগুলির সমাধান হয়নি।

যদি জাহান্দার শা দীর্ঘদিন বেচে থাকতেন, তবে হয়তো অব্যবস্থার একটা সুরাহা হ'ত।

কিন্তু বিষ প্রয়োগে তার অকাল মৃত্যু ঘটান হয়।

জাহান্দার শা প্রেমের জন্য সাম্রাজ্যের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছিলেন সুতরাং যুগসঞ্চিত সমস্যা এসে পড়ল ফররুকসিয়রের উপর।

তরুণ বাদশা বিরাট এক সমস্যার ভারে নত হয়ে পড়বার উপক্রম হলেন। ফররুকসিয়র সিংহাসনে আরোহণ করেই দেখলেন চতুর্দ্দিকে সমস্যা। মারাঠারা মোগল সাম্রাজ্যকে অনবরত কোনঠাসা করবার

চেষ্টা করছে। বাহাদুরশার সময় থেকেই রাজপুতরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে। শিখরাও দিল্লীর ক্ষমতাকে আর মেনে নিতে চাচ্ছেন না।

তাছাড়া ভাগ্যান্বেষি স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক আমিরেরা তো রয়েছেন।

এই বিশৃঙ্খল পরিবেশে মোগল সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করে চলা সহজ কথা নয়।

এদের মধ্যে সেই মুহূর্তে সবচেয়ে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রাজপুত রাজারা।

যুদ্ধ করে তারা বাহাদুর শাহকে অপমান করেছিলেন।

দীর্ঘ মুসলিম প্রাধান্য স্বীকারের পর স্বাধীন হবার জন্য স্পষ্টতই চেষ্টা করেছিলেন।

উদয়পুরে রাণা ওমরার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন অম্বর অধিপতি আর মালাবার রাজ।

স্পষ্টই তারা ঘোষণা করেছিলেন, মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখবেন না।

কোন বৈবাহিক সম্বন্ধ আর হবে না মোগলদের সঙ্গে।

রাজপুতনা থেকে মসজিদ ভেঙ্গে দেওয়া হতে লাগল।

মোগল সম্রাটের বিচার-প্রতিনিধি কাজী তাকে হটিয়ে দেওয়া হ'ল। মুসলমান ধর্মের চিহ্ন পর্য্যন্ত রাজপুতানায় থাকতে দেবেন না বলে তারা প্রতিজ্ঞা করলেন।

এই তিন রাজপুত-প্রধান তাদের কাজ আরম্ভ করলেন রাজপুতানায়। সমস্যায় পড়লেন ফর্‌রুকসিয়র।

দেওয়ানী আমে দরবার ডাকলেন তিনি।

ডাকলেন বললে ভুল হবে, তাকে দিয়ে ডাকালেন সঈদ ভাইয়েরা। দিল্লী প্রবেশ করবার পর প্রকৃতপক্ষে সকল ক্ষমতা তাদের হাতে চলে গিয়েছে।

নিজেদের ইচ্ছামত উপাধি গ্রহণ করেছেন তাঁরা।

হুসেন আলী গ্রহণ করেছিলেন আমির উলউম্‌রা উপাধি

আর আবদুল্লা—কুতুব-উল-মুলক।

নিজেদের ইচ্ছামত জায়গীরও বণ্টন করে নিয়েছিলেন ওরা।

ফর্‌রুকসিয়রের সম্মতির অপেক্ষা পর্য্যন্ত রাখেননি।

কিছু বলতে পারেননি ফর্‌রুকসিয়র। প্রথমত সঈদ ভায়েরাই তাকে সিংহাসনে বসিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের একটা প্রশ্ন আছে। দ্বিতীয়ত, সামরিক শক্তি তখন সম্পূর্ণ ওদের হাতের মুঠোয়।

সঙ্ঘবদ্ধ না হয়ে, দল গঠন না করে, ওদের বিরুদ্ধে যাওয়া হবে বোকামি।

সুতরাং নীরবে সবই সহ্য ক'রে নিলেন ফর্‌রুকসিয়র।

কিন্তু তার মধ্যে তিমুরের রক্ত যেন বিদ্রোহ করে উঠতে চাইল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সামরিক গৌরব অর্জন করে আরো ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করলেন সঈদ ভাইয়েরা।

ফর্‌রুকসিয়রকে দিয়ে দরবার আহ্বান করালেন।

আলোচ্য বিষয় হ'ল রাজপুতানার সমস্যা।

কিন্তু ফর্‌রুকসিয়র একটু অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

যুদ্ধ না করে বন্ধুত্বের মাধ্যমে যদি সমস্যা সমাধান করা যায়, তবে সেটাই হ'ত তার পক্ষে লাভজনক।

তা ছাড়া এক একটি যুদ্ধ ওম্‌রাহদের ক্ষমতা বাড়াবে।

যুদ্ধকালীন অবস্থাতে সামরিক বাহিনীর হাতে চলে যায় দেশ।

কিন্তু সাম্রাটকে অপেক্ষা করতে দিলেন না সঈদ ভাইয়েরা।

দরবার আহ্বান করতে বললেন।

তাঁরা এমন ভাব করলেন, মনে হ'ল অনুমোদনটা বাহুল্য মাত্র।

নিরুপায় বাদশা দরবার আহ্বান করলেন।

সমস্ত আমিরেরা উপস্থিত হলেন দরবারে।

আবদুল্লা খাঁ উত্তেজিত কণ্ঠে রাজপুত সমস্যার কথা তুলে ধরলেন

দরবারে। বললেন, রাজপুতানায় আজ মুসলমান ধর্ম বিপন্ন। তিনজন কাফের রাজপুত মিলিত হয়ে সেখানে মসজিত ভাঙছে, কাজি হত্যা করছে। হিন্দুস্থানের শাসন কর্তা হয়ে এ বিষয়ে আমরা উদাসীন থাকতে পারিনা।

ইস্লামের সেই বিপদের কথা স্মরণ করে আমি বলছি—মহামান্য বাদশা অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

ফর্রুকসিয়র তীক্ষ্ণ নজরে বিচার করে দেখলেন আমিরদের। তার মনে হল সবই পূর্বকল্পিত। আবদুল্লা খানের বক্তব্যের প্রতি সকলের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

একমাত্র বৃদ্ধ এনায়েৎ খাঁকে দেখে মনে হ'ল তিনি যেন এই উত্তেজনাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করছেন না. যদিও রাজপুতদের প্রতি মোটেই তার প্রেম নেই।

তাদের কাফের বলেই জানেন তিনি ; এবং কাফেরের বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থাকে ধর্ম্মযুদ্ধের মর্য্যাদা দিতে রাজি তিনি তথাপি তিনিও এর মধ্যে কি একটা যেন সন্দেহ করলেন।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে।

যুদ্ধের ভালমন্দ উভয় দিক বিচার করে দেখেছেন তিনি। যুদ্ধ যেমন বিদেশী শত্রুকে নাশ করে তেমনি গৃহ শত্রুরও সৃষ্টি করতে পারে।

আবদুল্লা আর হুসেন আলীর মধ্যে এক উচ্চাকাঙ্খার সন্ধান পেয়েছেন তিনি।

মোগল রাজবংশকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায় ওরা।

তাই তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ অনুমোদনের ভঙ্গি ছিল না।

ফর্রুকসিয়রও লক্ষ্য করলেন এনায়েৎ খাঁকে।

তাই তিনি বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে বললেন, জনাব, রাজনীতিতে আপনি অভিজ্ঞ লোক, আপনি বলুন এই মুহূর্তে আমাদের কি করা উচিৎ। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। একটা কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর দিকে সঈদ ভাইদুজন তাকালেন।

কি একটা যেন তখনি আঁচ করে নিলেন তাঁরা।

দু ভাইয়ের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল।

এনায়েৎ খাঁ বলতে লাগলেন, জনাব ইসলামের জন্য যে কোন যুদ্ধই ধর্ম্মযুদ্ধ একথা বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা দেখেছি সব সময় উন্মাদনায় লাভ হয় না। আলমগীর সারা জীবন যুদ্ধ করেও হিন্দুস্থান থেকে কাফেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন নি। সুতরাং আমার অভিমত যুদ্ধ করবার পূর্বে অন্যভাবে যদি কার্য্যসিদ্ধ হয় সেটা ভেবে দেখা। এবং সে বিচারের ভার জাহাপনার।

ফররুকসিয়র মনে মনে সন্তুষ্ট হলেন, যা হোক একজন সমর্থক অন্তত পাওয়া গেছে।

সেই প্রথম দিন এনায়েৎ খাঁর সঙ্গে দেখার কথা মনে পড়ল তাঁর।

কিন্তু আবদুল্লা খাঁ অপর দিকে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

হঠাৎ তিনি সম্রাটের অনুমতি না নিয়েই বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু আমি মনে করি···

তৎক্ষণাৎ এনায়েৎ খাঁ বাঁধা দিলেন, আমির উমরা কিন্তু সেইজন্য বোধটুকু হারিয়ে ফেলছেন। বাদশার অনুমতির প্রয়োজন হয় দরবারে আবেদন পেশ করতে হলে।

ও আমি দুঃখিত, বলে এমন এক অবজ্ঞার ভঙ্গি করলেন তিনি যা দেখে আকর্ণ লাল হয়ে উঠলেন ফররুকসিয়র। কিন্তু ক্রোধ চেপে গেলেন।

আবদুল্লা বলতে লাগলেন. মহামান্য বাদশা।

কথাটা যেন বিদ্রূপের মত শোনাল ফররুকসিয়রের কানে। এ ব্যাপারে আরো একজন লোক অসন্তুষ্ট হল বলে মনে হল, তিনি মিরজুমলা।

একটু ভ্রূকুটি করে তিনি তাকালেন আবদুল্লা খাঁর দিকে।

সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না আবদুল্লা।

কিন্তু বাদশা লক্ষ্য করলেন।

আবদুল্লা বলে চললেন, মহামান্য বাদশা, ইসলাম যখন বিপন্ন তখন ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিমত হওয়া উচিৎ নয়। তাছাড়া আমরা যদি এই মুহূর্তে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করি তবে বিদ্রোহীরা আমাদের দুর্বল ভাববে। ফলে নানা স্থানে আরো বিদ্রোহ ঘটবে। বাদশার শক্তির অভাবেই আজ মোগল সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে আমরা দুর্বল নই।

ফর্‌রুকসিয়র প্রশ্ন করলেন, আপনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলছেন?

আবদুল্লা বললেন, অবিলম্বে রাজপুতানার বিরুদ্ধে বাহিনী পাঠানো হোক। এবং হুসেন আলীকে সে বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হোক। যুদ্ধবিদ্যায় বোধ করি হুসেন আলীর মত দ্বিতীয় সেনাপতি এবং বান্দা বাদশার আর নেই।

রাজপুতানায় অভিযান প্রেরণে যদিও বাদশা অনুমতি দিতে রাজি তব হুসেন আলীর অধীনে পাঠাতে তিনি কোনক্রমে রাজি নন। —সামান্য কাজে আমির উল ওমরার মত মানী ব্যক্তিকে পাঠাতে চাইনে আমি। আমার মনে হয় এটা তাঁর যোগ্য কাজও নয়। তার চেয়ে জনাব মিরজুমলাকে পাঠান যাক।

বাদশা হঠাৎ এ প্রস্তাব করে বসবেন এটা ভাবতেও পারেননি আবদুল্লা। তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বাদশার দিকে তাকালেন।

মুহূর্তে বুঝতে পারলেন যে ফর্‌রুকসিয়র ক্রীড়নক হবার পাত্র নন। কিন্তু বন্য ঘোড়াকে বশ করতে তিনি জানেন।

বললেন, বেশ, জাহাপনার যা মর্জি করবেন। কিন্তু এর জন্য কোন বিপর্যয় হলে বাদশা যেন আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না। বিপর্যয় কথাটা এমন ভাবে ব্যবহার করলেন তিনি যে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন চোখ রাঙনীটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল।

ফর্‌রুকসিয়র নতি স্বীকার করলেন।

তখনো সামরিক শক্তি তাঁর হাতে নেই।

ঝুঁকি নিতে চাইলেন না তিনি।

বললেন, বেশ যদি কুতুবউলমুলক মনে করেন যে আমির উল ওমরাকে পাঠানোই যুক্তিসঙ্গত তবে তাই করুন। আপনাদের হাতেই সাম্রাজ্যের মঙ্গলা-মঙ্গলের ভার।

একটু যেন সন্তুষ্ট হলেন আবদুল্লা, বললেন, এ বান্দাকে বাদশা সব সময় বিশ্বাস করতে পারেন। আমাদের দ্বারা মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না কারো।

বাদশা বললেন, বেশ তবে আমির উল ওমরাকেই পাঠান।

আবদুল্লা বললেন, বাদশার অনুমতি হলে নিশ্চই পাঠাব। তবে প্রশ্ন হচ্ছে অভিযানের পূর্বে জাহাপনাকে মেহেরবানী করে একটি কাজ করতে হবে।

—বলুন ?

—আমির উল ওমরাকে সেনা বিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব দিতে হবে।

আবদুল্লা কি চাচ্ছেন বুঝতে পারলেন বাদশা।

কিন্তু কিছু করবার নেই।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ক্ষমতা তারা হস্তগত করেই আছেন।

অনুমোদনটা নাম মাত্র।

মনের মধ্যে পরাজয়ের বেদনাটা যথাসম্ভব চেপে রেখে হাসিমুখেই অনুমতি দিলেন বাদশা।

রাজপুতানার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের ব্যবস্থা হ'ল।

বাদশা ফিরে এলেন হারেমে।

তার ক্লান্ত ভাব দেখে ভয় পেল ফারুকউন্নিসা।

জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে জাহাপনা ?

ফররুকসিয়র বললেন, এবার স্পষ্ট বুঝতে পারছি সিংহাসন গ্রহণ করে ভুল করেছি।

—কেন খোদাবন্দ ?

—সাম্রাজ্য একটা কয়েদখানা, সম্রাট তার মধ্যে কয়েদী ভিন্ন আর কিছুই নন। পাটনায় যতটুকু স্বাধীনতা ছিল আমার, দিল্লীতে এসে এতটুকু নেই। সঈদ ভাইয়েদের হাতে খেলনায় পরিণত হয়েছি যেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন ফর্‌রুকসিয়র।

তার সুন্দর মুখখানা বেদনায় কেমন শ্রান্ত মনে হ'ল।

ব্যথা পেল বেগম।

সাম্রাজ্য যদিও তার কাম্য ছিল না, তথাপি পেলে পরে এর দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার ইচ্ছেও নেই তার। ফিরে যাওয়া যখন সম্ভব নয় তখন ব্যর্থতার কাছে হার মানতে রাজি নয় সে।

ফারুকউন্নিসা বলল, ভেঙে পড়লে তো চলবে না খোদাবন্দ। সম্রাট যখন হয়েছেন তখন নিশ্চয়ই সম্রাটের মতই হতে হবে। দিল্লীর বাদশা, দিল্লীর বাদশাই হবেন।

হতাশ ভাবে বললেন ফর্‌রুকসিয়র, কিন্তু আমি কোন পথ পাচ্ছি না।

স্বামীর দিকে গভীর ভাবে তাকিয়ে দেখল খানিক ফারুকউন্নিসা। তারপর বলল, দরবারে সবাই কি সঈদ ভাইদের দলে বলে আপনার বোধ হয়?

বাদশা বললেন, মিরজুমলা আর এনায়েৎ খাঁকে সে রকম মনে হচ্ছে না।

দিল্লীর ওমরাহ মহলে ওদের প্রতিপত্তি কি রকম?

—ঔরংজীবের ডান হাত ছিলেন ওরা, এখনো প্রচুর প্রভাব আছে বই কি।

ফারুকউন্নিসা যেন পথ পেল, বলল, তবে হতাশ হবার কি আছে?

বাদশা বললেন, আছে। এই মুহূর্তে হুসেন আলীকে মোগল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করতে বাধ্য হলাম আমি। রাজপুতানায় পাঠাতে হচ্ছে তাকে।

—এত ভালোই হ'ল। শাপে বর হয়েছে আপনার।

চমকে বাদশা তাকালেন বেগমের দিকে, কি বলছ তুমি?

বেগম ফারুকউন্নিসা বললেন, ঠিকই বলছি। হুসেন আলীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিন আপনি।

ইঙ্গিতটা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলেন বাদশা।

দুটো উজ্জ্বল চোখে তিনি তাকিয়ে দেখলেন ফারুকউন্নিসাকে, তারপর নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলেন।

সেই দিনই গোপন কক্ষে তিনি মিরজুমলা আর এনায়েৎ খাঁকে ডেকে আনলেন।

কেউ জানল না সে কথা, শুধু বেগম আর ভৃত্য রফিজুন ব্যতিরেকে। গোপন কক্ষে মিলিত হলে সম্রাট বললেন, আপনাদের আমি বিশেষ প্রয়োজনে ডেকেছি।

উভয়েই নত হয়ে বললেন, আদেশ করুন, এ বান্দারা আপনার হুকুম তামিল করতে সর্বদাই প্রস্তুত।

বাদশা বললেন, দরবারের ব্যাপারটা আপনারা লক্ষ্য করেছেন ?

—বলুন।

রাজপুতানা অভিযানে আবদুল্লার কোন অভিসন্ধি আছে বলে মনে হয় আপনাদের ?

এনায়েৎ খাঁ বললেন, স্পষ্ট। সামরিক শক্তি হাত করতে চায় সঈদ ভাইয়েরা। এবং ভয় দেখিয়ে আপনাকে দিয়ে তা করিয়েও নিয়েছে। আপনি ভুল করেছেন জাহাপনা।

মিরজুমলা বললেন, না জাহাপনা ঠিকই করেছেন। আমি আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি। সেই মুহূর্তে চাপ দিতে গেলে বিপরীত ফল ফলত।

বাদশা বললেন, কিন্তু আমি এখন কি করব বলুন ?

মিরজুমলা বললেন, আমার মনে হয় বাদশার খুব ভয়ের কারণ নেই। হুসেন আলীর রাজপুতানা অভিযান আমাদের মঙ্গলই হবে।

—কি রকম ?

তার অনুপস্থিতিতে আমরা নিজেদের শক্তিশালী করতে পারব।

কিন্তু কি করে সেটা সম্ভব, বাদশা আর এনায়েৎ খাঁ দুজনেই বুঝতে পারলেন না।

মিরজুমলা বললেন, আপনি শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করুন। আমার আর এনায়েৎ খাঁর শক্তি নিয়ে যদি আমরা আপনার পেছনে দাঁড়াই তবে জাহাপনা খুব দুর্বল থাকবেন না। আর এই মুহূর্তে আপনি মারাঠাদের সঙ্গে গোপনে চুক্তি করুন। ওরাই, সঈদ ভাইদের জব্দ করতে পারবে। আর রাজপুতানায়ও এই মুহূর্তে বার্তা পাঠান।

কোথায় ?

রাজা অজিত সিংহের কাছে।

কেন ?

মিরজুমলা বললেন, আপনারা অজিতকে চেনেন না কিংবা জানেন না। কিন্তু আমি বিলক্ষণ চিনি। এত শঠ কুচক্রী, স্বার্থপর রাজপুত মারবারে আর হয় নি। আপনি তাঁর সঙ্গে গোপনে মিত্রতা করুন। আর জানিয়ে দিন যে হুসেন আলীকে যেন ফিরতে না দেন তিনি। অজিত সিং যদি হুসেন আলীকে আটকে রাখতে পারেন, তবে আবদুল্লাকে ভয় নেই।

সকলেরই যেন মনঃপুত হ'ল এ প্রস্তাব।

তখনই গোপন প্রস্তাব পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল মহারাজা অজিত সিংহের কাছে। আর বাদশা ফররুকসিয়র মন্ত্রিত্ব বদল করলেন।

মিরজুমলাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন আর এনায়েৎ খাঁকে করলেন দেওয়ান। কুতুব উলমুলক আবদুল্লা মন্ত্রিত্বের রদবদলের কথা জানতে পারলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। হুসেন আলীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

নয়

মারবার।

অজিত সিংহের দরবার।

মহারাজ নিজে ভয়ানক চিন্তান্বিত।

মারবার, অম্বর, মেবার মিলে তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু দিল্লী বাহিনী একমাত্র মারবারের বিরুদ্ধেই প্রেরিত হয়েছে।

কেন?

সেই কেনর উত্তর ভাবছেন মহারাজ অজিত সিংহ।

নানা সন্দেহই উঁকি দিচ্ছে তাঁর মনে।

রাজপুতেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তো?

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মেবারের কথা মনে পড়তে অন্য রকম মনে হয়েছে।

মেবার আর যাই করুক বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করবে না কোন দিন। কিন্তু তাহলে দিল্লী বাহিনীর একমাত্র মারবারের বিরুদ্ধে আসবারই বা কি কারণ থাকতে পারে?

যাই হোক নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা যায় না। তাই দরবার আহ্বান করেছেন অজিত সিংহ।

সমস্ত রাঠোর রাজপুতেরা সমবেত হয়েছেন। বীরত্বে রাঠোর বংশীয়েরা কম যায় না।

আলমগীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে দুর্গাদাস তার পরিচয় দিয়েছেন।

রাঠোর রাজপুতদের মধ্যে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছেন তিনি।

সেই সমবেত রাঠোর নেতৃবৃন্দের কাছে কথা পাড়লেন অজিত সিং। বললেন, ফররুকসিয়র সিংহাসনে বসে দ্বিতীয় ঔরংজীব হবার চেষ্টা করছেন। হিন্দুস্থানকে মুসলমান রাষ্ট্র করতে চান তিনি। রাজপুতদের মধ্যে মারবারই এখন শ্রেষ্ঠ শক্তি। তাই আমির উল ওম্‌রাকে

পাঠালেন আমাদের বিরুদ্ধে। মোগলরা এর আগেও মারবারকে মুসলমান কবলিত করবার জন্য চেষ্টা করেছে, পারেনি। আমি আশা করি এবারও পারবেন না। মারবার প্রদেশের পূর্বেই আমরা হুসেন আলীকে বাধা দেব। একটি মুসলমান সৈন্যও যেন প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে না পারে।

বসন্ত সিংহ বললেন, মহারাজ এই মুহূর্তে অম্বর এবং মেবারকে সংবাদ দেওয়ার সম্বন্ধে আপনার অভিমত ?

অজিত সিং বললেন, প্রথমত আমি সন্দেহই করেছিলাম ওদের, কিন্তু এখন ভেবে দেখছি ওদের সংবাদ দিতে হবে। অন্ততঃ ওদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে আমাদের। যদিও মারবারের রাঠোররাই হুসেন আলীর পক্ষে যথেষ্ট।

মহারাজের এই সিদ্ধান্ত সকলেরই মনঃপূত হ'ল।

মেবার আর অম্বরকে সংবাদ পাঠানো ঠিক হ'ল।

কোন ক্রমেই আর মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করা হবে না ; এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল দরবারে।

ঠিক সেই সময় অজিত সিং খবর পেলেন বাদশা ফর্‌রুসিয়র দূত পাঠিয়েছেন রাঠোর দরবারে।

একটু আশ্চর্য্য হলেন মহারাজ।

সভাসদ অন্যান্য রাঠোর নেতৃবৃন্দও বিভ্রান্ত বোধ করলেন যেন।

এ কি নীতি।

এক দিকে অভিযান প্রেরণ অপর দিকে দূত প্রেরণ !

বসন্ত সিং বললেন, মহারাজের কি মনে হচ্ছে ?

শঠতায় অজিত সিং অন্যতম। বললেন. নিতান্ত ঘোরালো ব্যাপার। আলোচনার দ্বারা আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি বন্ধ করে অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করতে পারেন ওরা। আবার এও হতে পারে যে কি হতে পারে সেকথাটা আর তিনি স্পষ্ট করে কিছু বললেন না। হঠাৎ থেমে গেলেন।

কি হতে পারে তা জানবার জন্য কৌতুহলি দৃষ্টি মেলে অনেকেই তাকিয়ে থাকলেন তাঁর দিকে।

মহারাজ যশোবন্ত সিংহ বললেন, আলোচনার পূর্বে বাদশার দূতের সঙ্গে দেখা করে নেওয়া ভাল। তাকে এখানে নিয়ে এস।

দরবারে নিয়ে আসা হ'ল রফজুন খাঁকে।

যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে রফজুন দরবারে এসে দাঁড়ালেন।

মহারাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে পর্য্যবেক্ষন করতে লাগলেন যেন, তারপর বললেন, কি খবর খাঁ সাহেব?

রফজুন বললেন, বাদশা ফর্‌রুকসিয়রের ব্যক্তিগত কাজে আমি আপনার কাছে এসেছি।

একটু বিদ্রুপ করলেন অজিত সিংহ। বললেন, তার জন্য তো আমির উল ওম্‌রাকেই পাঠানো হয়েছে?

রফজুন বললেন, মহারাজের ভাবনার উপর আমাদের হাত নেই। বাদশার বক্তব্য শুনবার পর আপনি যথা ধারনা করবেন।

আজিত সিংহ জানালেন, বলুন, বাদশার কি বক্তব্য?

রফজুন বললেন, বক্তব্য গোপনীয়, ব্যক্তিগতভাবে আপনাকেই জানাতে বলেছেন তিনি।

কথা শুনে দরবারের সকলে যেন মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

অজিত সিংহ যেন একটু আশ্চর্য্য হলেন।

তিনি রফজুনকে নিয়ে পাশের কক্ষে চলে গেলেন।

মহারাজ বললেন, বলুন আপনার কি বক্তব্য।

রফজুন বললেন, মহারাজ বাদশা আপনাকে এই জানাতে বলেছেন যে, এ অভিযান তাঁর ইচ্ছায় হয়নি। সঈদ ভাইয়েরা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরনের জন্য মারবারের বিরুদ্ধে এ অভিযান প্রেরণা করেছেন।

গম্ভীরভাবে অজিত সিংহ বললেন, হুম্। তারপর?

রফজুন উত্তর দিলেন, বাদশার ইচ্ছা আপনি হুসেন আলীকে

এখানে আটকে রাখুন। বিনিময়ে বাদশা আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।

—কি রকম পুরস্কার ?

—মোগল দরবারের আপনি উচ্চ আমিরের পদ পাবেন। আপনাকে দশ হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করা হবে।

অজিত সিংহ আর একবার তাকিয়ে দেখলেন রফজুনকে। বললেন, কিন্তু আপনি জানেন কি যে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি দিল্লী দরবারের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখব না ? রাজনৈতিক, বৈবাহিক কোন সম্বন্ধই আর স্থাপন করা হবে না ?

রফজুন উত্তর দিলেন, এ সমস্ত কিছুর মূলে ছিল রাজনৈতিক মর্য্যাদার প্রশ্ন। স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে বাদশার সঙ্গে মিত্রতা করতে বাধা কোথায় ?

লক্ষ্য করে শুনলেন অজিত সিং কথাটা।

নিতান্ত হিসেবী লোক তিনি।

মিত্রতার কথা, স্বার্থের কথা সবই লাভ লোকসান দিয়ে সীমিত।

রফজুনের প্রশ্নে অন্য কি একটা ইশারা পেলেন যেন তিনি, বললেন, আচ্ছা আমি ভেবে দেখছি। আপনাকে পরে জানাব।

রফজুন বললেন, সময়ের নিতান্ত অভাব। সিদ্ধান্ত একটু দ্রুতই নিতে হবে মহারাজ। যদি আপনি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন তবে আপনি বাদশার দক্ষিণ হস্ত হবেন।

হুসিয়ার অজিত সিং ঠিক অরাজিও হলেন না, রাজিও হলেন না। বললেন, আচ্ছা।

রফজুন বললেন, তাহলে আমি বাদশাকে কি বলব ?

অজিত সিং উত্তর দিলেন, আমার স্বার্থ রক্ষা হলে আমিও তাঁর বিপক্ষে যাব না।

—ধন্যবাদ। উঠে দাঁড়ালেন রফজুন।

আবার দরবারে এলেন তাঁরা।

রফজুন বিদায় নিলেন।

গোপন কথা সাম্রাটও দরবারে প্রকাশ করলেন না।

শুধু যখন প্রশ্ন করা হ'ল, মহারাজ কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন?

অজিত সিং উত্তর দিলেন ; আমির উল ওম্‌রার সঙ্গে সসৈন্যেই দেখা করব।

তাহলে মারবার অধিপতি যুদ্ধ করাই সাব্যস্ত করেছেন একথা সকলে ভেবে নিলেন।

রাঠোর সৈন্যরা প্রস্তুত হতে লাগল আমির উল ওম্‌রার বিরুদ্ধে।

অপর দিকে মারবারের পথে রাজপুতনার কাছে এসে রফজুনের দৌত্যের কথা জানতে পারলেন হুসেন আলী।

তৎক্ষণাৎ আর মারবারের দিকে অগ্রসর না হয়ে থামলেন তিনি!

সম্পূর্ণ ব্যাপারটা একটা রহস্যের মত মনে হ'ল তার কাছে। এর কিনারা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধটা বাঞ্ছনীয় মনে হ'ল না তাঁর কাছে।

তিনি দিল্লীতে কুতুব-উল-মুলক আবহুল্লার কাছে সঠিক খবরের জন্য লিখে পাঠালেন। এবং অন্তর্বর্তী খবরের জন্য রাজপুতানার প্রান্ত দেশে অপেক্ষা করে থাকলেন।

এদিকে অজিত সিংহও তাঁর হঠাৎ স্থিতি দেখে করণীয় ঠিক করে উঠতে পারলেন না।

অবশেষে সংবাদ এল দিল্লী থেকে।

আবহুল্লা জানালেন সম্ভবত ফর্‌রুকসিয়র অজিত সিংহকে হুসেন আলীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন এবং নিজেকে মহারাজের মিত্রতা-কাঙ্ক্ষী বলে জানিয়েছেন। দিল্লীর রাজনৈতিক আবহাওয়াও ঐ সঙ্গে জানিয়ে দিলেন তিনি।

মিরজুমলাকে মন্ত্রী এবং এনায়েৎ খাঁকে যে দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়েছে একথাও জানালেন তিনি।

চতুর হুসেন আলী তখনই বুঝে নিলেন যে ফর্‌রুকসিয়র তাঁদের পরিচালনা মেনে চলতে আর রাজি নন।

সম্ভবতঃ তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন।

এই মুহূর্তে অজিত সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াটা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না তিনি।

বরং মারাঠাদের ভয়ে রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতার চেষ্টা করলেন। সুতরাং সবাহিনী মারবারে অগ্রসর না হয়ে তিনি দূত মারফৎ অজিত সিংহকে প্রস্তাব পাঠালেন।

প্রস্তাব হল সন্ধির কথা নিয়ে। সন্ধি এবং সঈদ ভাইদের সঙ্গে মিত্রতা।

পরিবর্তে বাদশার দরবারে মর্য্যাদাপূর্ণ আসনের লোভ দেখালেন তারা।

সংবাদ শুনে অজিত সিং আবার ভাবলেন।

বাদশার কাছ থেকে যে মিত্রতার প্রস্তাব এসেছে তা বেমালুম চেপে গেলেন।

তবে বুঝতে পারলেন যে দিল্লী দরবারে প্রাধাণ্য পেতে হলে সঈদ ভাইদের সাহায্যই বেশী প্রয়োজন হবে।

এটাও তিনি আঁচ করে নিলেন যে প্রকৃত ক্ষমতা এখন সঈদ ভাইদের হাতেই।

সুতরাং হুসেন আলীর সন্ধির প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করলেন। শিবিরে সাক্ষাৎ করলেন উভয়ে।

মহারাজ অজিত সিংকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আমির উল্ ওম্‌রা, আসুন, আসুন জনাব।

অজিত সিং চতুরতম রাজপুত।

প্রথম দেখাতেই বুঝে নিলেন যে হুসেন আলী ষড়যন্ত্রপটু। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ নীতি গ্রহণ করতে হবে তাকে। বললেন, বলুন আমির সাহেব কি খবর।

হুসেন আলী বললেন, আপনাদের সঙ্গে দিল্লীর সম্বন্ধটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তাই এলুম আর কি।

অজিত সিং বললেন, এর জন্য কিন্তু আলমগীর দায়ী। তিনি যদি আমাকে গদিচ্যুত করে ধর্মান্তরীত করবার চেষ্টা না করতেন তাহলে হয়তো হত না।

হুসেন আলী বললেন, সে যাক। অতীতকে টেনে এনে লাভ নেই। আসুন নতুন করে দোস্তি করি।

কি সর্তে? তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলেন অজিত সিং।

হুসেন আলী বললেন, সর্ত এই যে আপনি আমাদের সঙ্গে প্রতিপত্তি ভাগ করে নেবেন। আপনার প্রতিপত্তি বাড়বার সম্ভাবনা আছে।

নীরব থাকলেন মহারাজ।

নিজের স্বার্থের জন্য তিনি রাজপুত মিত্রতা যখন তখন ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

মৌনং সম্মতি লক্ষণং, হুসেন আলী ধরে নিলেন যে মহারাজ রাজি।

বললেন তিনি, নতুন মিত্রতা যাতে পাকা হয় তার জন্য কিন্তু একটি কাজ করতে হবে মহারাজ!

"কি কাজ?" আশ্চর্য্য হয়ে তাকালেন মহারাজ।

হুসেন আলী বললেন, আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে।

ইঙ্গিতটা বুঝে নিলেও আরো স্পষ্ট হবার জন্য অজিত সিং প্রশ্ন করলেন।

—কি রকম বলুন?

—আকবর বাদশা যেরকম করেছিলেন সেই রকম আর কি।

অজিত সিংহ বললেন, অর্থাৎ বৈবাহিক সম্বন্ধ এই তো?

হুসেন আলী বললেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই। শুনেছি আপনার এখনো অবিবাহিতা কন্যা আছে।

নীরব হুসেন আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন শুধু মহারাজা কি যেন ভাবতে লাগলেন।

কি ভাবতে লাগলেন ?

সম্ভবত লাভ লোকসান দুটো দিক তলিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি।

মোগল বাদশার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে কোন সময়ে প্রচুর লাভবান হয়েছেন অম্বরাধিপতি ?

অপর পক্ষে স্বদেশ প্রেমের জন্য দারিদ্র্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন রাণা প্রতাপ সিংহ।

এই মুহূর্তে মোগল বাদশার দরবারে প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারল নানা দিক থেকেই লাভ।

শুধু মনসবদার হয়ে থাকাই নয়, আরো বেশী।

মান সিংহ যা পারেননি, অজিত সিং হয়তো তাই পারবেন।

মোগল সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হতে পারবেন তিনি।

এই সমস্ত নানা দিক ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন মহারাজ।

মহারাজের মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলেছে, সেটা হুসেন আলী স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, বললেন, কি, আমার প্রস্তাব কি মনোমত হয়নি ?

—হ্যাঁ; না হবার মত কিছু নয়, তবে কিনা।

—বলুন !

অজিত সিং বললেন, আপনি তো জানেন যে আমি মোবার আর অম্বরের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আর মোগলদের সঙ্গে কোন প্রকার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করব না।

হুসেন আলী বললেন, মহারাজকে অভিজ্ঞ লোক বলেই জানি। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞার ক্ষমতা কতদূর সেটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না আশা করি।

অজিত সিং বললেন, তবে কথা হচ্ছে কি জানেন; মারবার বড় খুদ্র রাজ্য, এতে ঠিক—।

হুসেন আলী তৎক্ষণাৎ বললেন, ঠিক আছে, অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্য-

গুলি মারবারের তাবেদার ভুক্ত হয় সে বিষয়ে বাদশার ফারমান দেওয়া হবে আপনাকে।

—তাহলে অবশ্য বাদশার সঙ্গে এ ঐতিহাসিক বিবাহে আমাদের ধন্য মনে করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

অজিত সিংহের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন হুসেন আলী।

ঠিক যে মুহূর্তে যোধপুরের উচ্চাকাঙ্খি তুজন রাজপুরুষের কাছে মোগল সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলা চলছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ভাগ্যের জুয়া খেলার বিরুদ্ধে প্রেমের প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করছিল তুটি হৃদয়, ফর্‌রুকসিয়র আর ফারুকউন্নিসা।

এনায়েৎ খাঁর সমর্থন আর মিরজুমলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নিজেকে একটু নিরাপদ মনে করছিলেন নতুন বাদশা। নিতান্ত ষড়যন্ত্র আর আমিরদের নিষ্ঠুর রাজনীতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

নিষ্ঠুর বাস্তবতার মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে না। ভাবলেন ফর্‌রুকসিয়র

তাই হৃদয়টাকে অনেকটা হাল্কা মনে হলে তিনি এলেন হারেমে ফারুকউন্নিসার কাছে।

বাদশার হাসিখুসী ভাবটা লক্ষ্য করে অনেকদিন পরে আবার আশ্চর্য্য হল ফারুক!

বাদশার দিকে কিছুটা সকৌতুকে তাকিয়ে থেকে বললেন, জাহাপনাকে আজ খুব খুসী মনে হচ্ছে?

প্রেয়তমা পত্নীর অনেকটা নিকটে এসে দাড়ালেন বাদশা!

কি এক উন্মাদনায় তিনি যেন স্পর্শ করলেন তাকে।

ফারুকউন্নিসা বললেন, কি হয়েছে খোদাবন্দ?

ফর্‌রুকসিয়র বললেন, বিরাট এক চিন্তার দায়িত্ব অনেকটা থামিয়ে এলাম আজ!

—কি রকম?

—সঈদ ভাইদের অপ্রতিহত ক্ষমতা এবার কিছুটা কমবে।

—কেন ?

আলমগীরের বংশধরকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন মিরজুমলা আর এনায়েৎ খাঁ।

ফারুকউন্নিসা তাকিয়ে তাকিয়ে স্বামীকে দেখতে লাগলেন তবু কোন কথা বললেন না।

ফর্‌রুকসিয়র আবার বললেন; ওরা দুজনেই বিশেষ প্রভাবশালী। সঈদদের দুর্নীতিকে ওরা কিছুটা আটকে রাখতে পারবে। ওরা যদি আমাকে সাহায্য করেন তবে এবার আমি সত্যি সম্রাট হতে পারব।

ফারুকউন্নিসা তেমনি তাকিয়ে থাকলেন স্বামীর মুখের দিকে। তার সেই স্নিগ্ধ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে হেসে দেখলেন যেন বাদশা। ওঃ তুমি ভাবছ তা'তে তোমার কি লাভ হোল এই তো? তোমারও লাভ হয়েছে। তোমাকে ভুলিনি আমি ফারুক। এবার থেকে তোমাকে আমি আরো ঘনিষ্ঠ করে নেব।

ফারুকউন্নিসা এবার উত্তর দিলেন, আমি কিন্তু বাদশাকে আর কখনো একক সুখ উপভোগের জন্য চাইব না।

বাদশা বললেন, একি, এখনো আমার উপর অভিমান করে বসে আছ তুমি?

ফারুক বললেন, না জনাব অভিমান নয়। বাদশার পক্ষে প্রেমিক হওয়া সম্ভবপর নয়।

—কেন তিনি কি মানুষ নন ?

—না সেজন্য নয়। বাদশা হলে প্রেমের সীমান্ত অনেকটা বেড়ে যায়। এক ছাড়িয়ে অনেকের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয়। এখন শুধু মাত্র আমার স্বামী নন, আপনি এই হিন্দুস্থানের ঈশ্বর।

—সে দায়িত্ব পালন করতে কি, ব্যক্তি সুখকে উপভোগ করা যায় না ?

প্রশ্ন করলেন ফর্‌রুকসিয়র।

ফারুকউন্নিসা বললেন, হয়তো যায়। কিন্তু তাতে কর্তব্য কতটা রক্ষা করা হয় সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জাহান্দার শা, লালকুমারীই তাঁর প্রধান।

একটু হেসে তখন বাদশা বললেন, না, এর উপরে আরো উদাহরন আছে। শাজাহান মমতাজ সম্রাট-সম্রাজ্ঞী হয়েও ভালবাসার নীড় রচনা করতে পেরেছিলেন তাঁরা।

—তাঁরা অনেক বড় বলে একটা শ্রদ্ধাসূচক ভঙ্গি করলেন ফারুক।

তা দেখে মৃদু হেসে বাদশা বললেন, তাঁরা বড় হলেও, আমরা তাদেরই বংশধর। মোগলের প্রেমের রক্ত আমাদের মধ্যেও রয়েছে।

আবার মুগ্ধ চোখে বাদশার দিকে তাকিয়ে দেখলেন ফারুকউন্নিসা।

বাদশা বললেন, সাম্রাজ্য কখনো প্রেমকে গ্রাস করতে পারবে না ফারুক, তুমি দেখে নিও। তোমার প্রতি আমার ভালবাসার এতটুকু ব্যতিক্রম হবে না সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি বলে। ব্যক্তি ও সমষ্টির সমন্বয় যে ঘটাতে পারে সেইতো সম্রাট।

কি একটা আবেগে বেগমকে কাছে টানলেন বাদশা।

বিস্তৃত, উন্নত বক্ষের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করলেন ফারুকউন্নিসা।

বাদশা একটা কপোত কূজনের মত তার কানে কানে যেন বলে চললেন, তুমি আমার নতুন মমতাজ হবে ফারুক। কালজয়ী এক স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করব আমি, তোমার আর আমার। তোমার প্রেমকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই।

স্বামীর বুকের নীড়ে আর একটু আশ্রয় খুঁজল ফারুক, তারপর বললেন, ঐশ্বর্যের প্রহসনে কি প্রয়োজন জাহাপনা। এই যে মুহূর্ত, এইতো কালজয়ী।

বাদশা আরো নিবিড় করে টেনে আনলেন তার প্রিয়তমাকে বুকের কাছে।

দশ

সংবাদ এসেছে দিল্লীতে।

বিনা মেঘে বজ্র পাতের মতই সংবাদ এসেছে।

সংবাদ এসেছে, হুসেন আলী আর মহারাজ অজিত সিংহ যুদ্ধ না করে মিত্রতা করেছেন।

তরুণ বাদশা যখন পরম নিশ্চিন্তে নিজেকে নিরাপদ মনে করে প্রেমের স্বপ্ন দেখছিলেন, যখন তিনি পিতৃশত্রু মুর্শিদকুলি খাঁর বিরুদ্ধে বাঙলাতে অভিযান প্রেরণ করবেন বলে ভাবছিলেন, সেই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত সংবাদ তাকে বিচলিত করে দিল।

সঈদ ভাইদের সঙ্গে রাঠোর পুত্রের এই মিলন বাদশাকে আবার দুর্বল করে দিয়েছে।

হিন্দুস্থানের স্বাধীন শাসক হবার স্বপ্ন তার বিলীন হবার উপক্রম হয়েছে।

শুধু তাই নয়, তার প্রেমের নীড়কেও তা কাঁপিয়ে তুলেছে।

অজিত সিংহের সঙ্গে বৈবাহিক চুক্তি করেছেন আমির-উল-ওমরা হুসেন আলী।

রাঠোর নন্দিনী রায় ইন্দর কুনয়ার।

মোগল বেগমের মর্যাদা দিতে হবে তাকে।

এ বন্ধন মোগলদের সঙ্গে রাজপুত প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ় করবে।

মোগল বাদশার পক্ষেও এ গৌরবের কথা, কিন্তু গৌরবান্বিত মনে করলেন না নিজেকে ফররুকসিয়র।

এ প্রীতির সম্পর্ক নয়, এ চক্রান্তের জাল।

বাদশাকে সে জালে আবদ্ধ করতে চান সঈদ ভাইয়েরা!

হুসেন আলী যোধপুর থেকে লিখে পাঠিয়েছেন রাঠোর নন্দিনীকে দিল্লী নিয়ে যাবার জন্য।

বাদশার মাতুল সায়েস্তা খানকে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন হুসেন আলী।

কন্যা তুলে নিয়ে যাওয়া হবে দিল্লীতে।

অথচ এর জন্য বাদশার অনুমতিটুকু নেওয়া প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি।

সম্রাটের ব্যক্তিসত্বার যেন কোন মূল্যই নেই।

তিনি যেন রাজনীতির ঘুটি, তাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছে দাবার চাল দেওয়া যাবে।

সহসা এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছেন না ফরুক্কসিয়র।

তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর কথা মনে করেও তিনি ব্যথা পাচ্ছেন।

অথচ আমির-উল্-ওমরার ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এখনো সামরিক শক্তিতে তিনি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেন নি।

এনায়েৎ আর মিরজুমলা এখনো সঈদ ভাইদের বিরুদ্ধে দল গঠন শেষ করতে পারেন নি।

বাদশা নিদারুণ সমস্যাতে গোপনে কক্ষে ডাকলেন এনায়েৎ আর মিরজুমলাকে।

এনায়েৎ আর মিরজুমলাও ততক্ষণ জানতে পেরেছিলেন সব। তারাও কম আশ্চর্য হননি।

ওরা ভাবতেও পারেন নি যে অজিত সিং বাদশার সুবিধাজনক প্রস্তাব অস্বীকার করে হুসেন আলীর সঙ্গে মিত্রতা করবেন।

কুটনীতির ক্ষেত্রে হুসেন আলীর এ এক বিরাট জয়লাভ। এবং এই বৈবাহিক প্রস্তাব আরো সন্দেহ জনক।

বাহ্যত প্রমাণ হবে যে সঈদ ভাইয়েরা বাদশাহের শক্তিবৃদ্ধির জন্যই এসব করছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবার

উপক্রম করেছেন সঈদ ভাইয়েরা। তাঁদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে নতুন যে শক্তি গড়ে উঠছিল, এ মিত্রতার দ্বারা তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হোল।

রাজনীতির দিক থেকে বিচার করতে গেলে এ বিবাহ-প্রস্তাব অস্বীকার করাও চলে না।

রাজপুতদের সমর্থন ফিরিয়ে আনা বর্তমানে মোগল বাদশার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

সেইক্ষেত্রে বিবাহ প্রস্তাব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু স্বীকার করলেও ব্যক্তিগত পরাজয়।

বাদশা তাই যেন অসহায় দৃষ্টিতে এনায়েৎ খাঁ আর মিরজুমলার দিকে তাকালেন।

সমস্ত বুঝতে পেরেও ওরা নিজেরা কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না।

ফররুকসিয়র বললেন, সমস্ত শুনেছেন আপনারা?

—শুনেছি।

—বলুন এখন কি করা যায়?

মিরজুমলা বললেন, জাহাপনা এ এক বিরাট সমস্যা। হুসেন আলী কূটনৈতিক চাল চেলেছেন।

বাদশা বললেন, এর ফল নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন?

মাথা নীচু করে বললেন মিরজুমলা, হ্যাঁ। সঈদ ভাইদের বিরুদ্ধে কোন দল গঠন করতে দিলে না ওরা। ওরাই প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হয়ে থাকতে চায়?

বাদশাকে একটু উত্তেজিত দেখাল। তাঁর তরুণ রক্ত সহজে এ পরাজয় মেনে নিতে রাজি নয়।

তিনি বললেন, আমি এ ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজি নই। হুসেন আলীকে লিখে দিতে চাই যে অজিত-সিংহের সঙ্গে মিত্রতা অসম্ভব, আপনি মারবার আক্রমণ করুন।

সহসা এনায়েৎ বা মিরজুমলার মধ্যে কেউ উত্তর দিতে পারলেন না।

অবশেষে একটু ভেবে এনায়েৎ বললেন, যদি হুসেন আলী আপনার আদেশ অমান্য করে ?

ক্রোধে রক্তাভ হয়ে উঠলেন বাদশা। তিনি কিছু বলতে পারলেন না।

এনায়েৎ বললেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা আরো বেশী প্রকাশ হয়ে পড়বে। অপর পক্ষে হুসেন আলী যদি আমাদের অস্বীকারও করেন তার অন্যায়টা তত চোখে পড়বে না। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের স্বার্থের সাফাই গেয়ে বিপদ অতিক্রম করে যাবেন।

মিরজুমলা বললেন, অবশ্য এক কাজ করা যায়, আমির-উল-ওমরাকে অম্বর আর মেবার আক্রমণ করতে বলা যায়। তাহলে তিনি সেখানে আটকে থাকবেন।

কিন্তু তার প্রস্তাব এনায়েৎ খাঁর মনমত হ'ল বলে মনে হ'ল না।

তিনি বললেন, কিন্তু হুসেন আলি আমাদের আদেশ মানবে বলে মনে হয় না, এখন ওসব কিছু না করাই বাঞ্ছনীয় হবে। বরং বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়াই বাদশার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

—কি রকম ?—প্রশ্ন করলেন মিরজুমলা।

এনায়েৎ বললেন, অজিত সিং যদি আমাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন তবে মেবার আর অম্বরের সঙ্গে তার কথার খেলাপ হবে তখন আত্ম-কলহ ওদের অবশ্যম্ভাবি। সেই কলহে আমরা সুযোগ গ্রহণ করতে পারব।

প্রস্তাবটি নিতান্ত যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাদশার তবু যেন পছন্দ হ'ল না।

রাজনীতির উর্দ্ধেও কোথাও কি যেন একটা আছে। সেইখানে কে যেন আঘাত করতে লাগল বাদশার।

হয় তো সেই মুহূর্তে প্রিয়তমা-পত্নী ফারুকউন্নিসার মুখখানা ভেসে উঠেছিল তাঁর মনে।

'নতুন বিবাহ কি প্রেমের অবমাননা করবে না?' এই প্রশ্নও এসেছিল।

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে বাদশা তাই ম্রিয়মান।

এনায়েৎ খাঁ বাদশার এই বিমর্ষতা লক্ষ্য করে বললেন, জাহাপনার অভিমত কি?

বাদশা বললেন, বিবাহটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। হুসেন আলী কি করে এ চুক্তি করতে পারল ভেবে অবাক হচ্ছি আমি।

সম্রাটের কথার ভঙ্গিতেই যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন এনায়েৎ, বললেন, বিবাহটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বটে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। এবং আপনাকে এই সময় ব্যক্তি হিসেবে ভাবেন নি হুসেন আলী। আপনি একটি জাতির প্রতীক।

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ফররুকসিয়র। তাই বলে ব্যক্তি সত্ত্বা বিসর্জন দিতে হবে?

একটু মৃদু হেসে এনায়েৎ খাঁ বললেন, রাজকার্য্য তো তাই বাদশা। ব্যক্তি সুখকে বিসর্জন দিতে না পারলে যে শাসক হওয়া যায় না।

বাদশা বললেন, তথাপি এ বিবাহ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এনায়েৎ খাঁ একটা সমবেদনার সুর নিয়ে বললেন, আপনার ব্যথাটা বুঝতে পারি বাদশা। কিন্তু বহু বিবাহ তো আমাদের শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়। তা ছাড়া বিবাহ করলেই নতুন বেগমের মনোরঞ্জন করতে হবে এমনও কথা নেই। মোগল হারেমে অবিবাহিতা অবস্থায়ও অনেক বেগম থাকেন।

সাদী আর বেগম যত বেশী হবে ততই বাদশার পক্ষে গৌরবের।

একথা ফররুকসিয়রও জানেন, তবু কেন যেন তাঁর অন্তর এতে সায় দিতে পারছে না। তিনি চুপ করে থাকলেন।

অনেকক্ষণ পর মিরজুমলা কথা বললেন। বললেন, আপনি সম্মতি দিন জাহাপনা। আমাদের নিজেদের স্বার্থের দিক থেকেও হয়তো এটা প্রয়োজনীয় হতে পারে! আজ হয়তো হুসেন আলী

অজিত সিংহের মিত্র হতে পারেন, কিন্তু কাল আপনি যখন তাঁর আত্মীয় হবেন, তখন আপনার দিকেই তার ঝুঁকে পড়ার বেশী সম্ভাবনা মহারাজ। অজিত সিং একজন শক্তিশালী রাজপুত. তাঁর সাহায্য পেলে সঈদ ভাইয়েদের প্রাধান্য হয় তো অস্বীকার করা যেতে পারে। হয় তো মিরজুমলার কথা মনঃপূত হল। বাদশা ভাবলেন, নতুন ব্যবস্থা ভবিষ্যতে তাঁর শক্তির বৃদ্ধি করতে পারে। তিনি অগত্যা স্বীকার করলেন। বললেন, বেশ আপনারা যদি ভাল মনে করেন তাই হবে।

এনায়েৎ খাঁ বললেন, তবে হুসেন আলীর নির্দেশ অনুযায়ী শায়েস্তা খাঁকে মারবার পাঠিয়ে দিন।

বাদশা বললেন, বেশ তাই হবে।

এর পর দরবার ভাঙল।

একটা চিন্তা, ভারাক্রান্ত মন নিয়েই যেন সবাই ফিরলেন।

বাদশা নিজে নিতান্ত বিমর্ষ হয়ে হারেমে এলেন।

সেই মুহূর্তে নিজের প্রতিবিম্ব দর্পণে দেখলে বোধ করি তিনি নিজেই চমকে উঠতেন।

যেন বিরাট একটা বিপর্য্যয় ঘটে গিয়েছে তাঁর উপর দিয়ে।

যেন দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর তিনি কেবলমাত্র উত্থান শক্তি ফিরে পেয়েছেন কিম্বা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এসেছেন।

বাদশার দিকে তাকিয়ে,—ফারুকউন্নিসা তাই যেন চমকে উঠল। বলল, কি হয়েছে আপনার জাহাপনা? কোন খারাপ সংবাদ এসেছে কি?

—হ্যাঁ, নিতান্তই দুঃসংবাদ, বললেন ফরুরুকসিয়র।

বুকটা যেন চমকে কেঁপে উঠল ফারুকউন্নিসার, কি হয়েছে খোদাবন্দ!

বিষণ্ণভাবে বললেন বাদশা, আমরা সঈদ ভাইয়ের হাত থেকে মুক্তি পেলাম না।

—কেন ?

—মহারাজ অজিত সিংহের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধ করছেন। উল্টে, তার দলই বাড়ল। দিল্লী আসবার আয়োজন করছেন তাঁরা।

—ভয় পেয়ে যেন বলল ফারুকউন্নিসা, কেন ? দিল্লী আক্রমণ করবে ?

বাদশা বললেন, না আক্রমণ করবার প্রয়োজন হবে না, কারণ বাধা দেবার শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু সে যে আক্রমণের চেয়েও বেশী।

—কি জাহাপনা ?

—বাদশা হয়েও, আমিই যে তার হাতের গোলাম। এ বাদশাহীর কি মূল্য আছে !

এবার যেন একটু আশ্বস্ত হ'ল ফারুকউন্নিসা, বলল, ও, এই কথা ! তার জন্য এত ভাবনার কি আছে। বাদশরা চিরকালই এমনি বন্দী বই কি, স্বাধীন ভাবে চলবার ইচ্ছে তাঁদের নেই। বাদশাহী একটা সং ছাড়া আর কিছু নয়।

ফর্‌রুকসিয়র বললেন, না, উড়িয়ে দেবার কথা নয়। শুধু এই নয়, এর চেয়ে আরো বড় বিপদ—

—কি জাহাপনা ?

—আমার ব্যক্তি সত্তাকে অস্বীকার করেছে হুসেন আলী।

—কি রকম ?

বাদশা বললেন, আমার অনুমতি না নিয়েই সে আমারই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছে—

—একটু যেন ভয় পেল ফারুক। আবার কালো একটা শঙ্কা নেমে আসতে দেখতে পেল তার মুখের উপর। বলল, কার সঙ্গে খোদাবন্দ ?

ক্রুদ্ধ হয়ে যেন বললেন ফর্‌রুকসিয়র, একজন কাফেরের সঙ্গে, এক রাজপুত রমণীর সঙ্গে।

—কে ?

—মহারাজ অজিত সিংহের কন্যা।

এক মুহূর্ত যেন ফারুকও কথা বলতে পারল না।

বাদশাও নীরব হয়ে থাকলেন।

অবশেষে বাদশা বললেন, না ফারুকউন্নিসা এ হয় না।

ফারুকউন্নিসা বলল, এ বিবাহ ঠিক করেছেন কেন আমির ওমরা ?

—রাজপুতদের সঙ্গে হৃত সম্পর্ক ফিরিয়ে আনবার জন্য। জান, এনায়েৎ খাঁ পর্য্যন্ত সমর্থন করেন। তিনি কি বলেন শুনেছ ? বলেন বাদশা ব্যক্তি নন, প্রতীক। জাতির প্রতীক। সুতরাং জাতির স্বার্থে প্রয়োজন হলে তাকে এ বিবাহ করতেই হবে।

ফারুকউন্নিসা বলল, আপনার কি অভিমত জাহাপনা ?

বাদশা বললেন, ভালবাসার অবমাননা করতে পারি না। সম্ভব হলেও ব্যক্তিকে বিসর্জন দিতে রাজি নই আমি।

একটু যেন কৌতুক করেই জিজ্ঞেস করল ফারুক, কার ভালবাসা খোদাবন্দ ?

সহজ, স্পষ্ট উত্তর দিলেন বাদশা, তোমার।

হৃদপিণ্ডের তন্ত্রিতে প্রবল ঝঙ্কার দিয়ে উঠল যেন সে শব্দ, তোমার তোমার, তোমার।

সেই মুহূর্তে কী ভাল লাগল ফারুকউন্নিসার বলে বোঝান যায় না।

নীরব থেকে সেই ভাবটাকে অনুভব করবার চেষ্টা করল যেন সে।

বাদশা তার নীরবতা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মত ?

ফারুক বলল, খোদাবন্দ আমি যে এখন নিজে সম্রাজ্ঞী। আমারও কি ব্যক্তিসত্তা আছে ? প্রয়োজন হলে এ বিবাহ আপনাকে করতে হবে বৈকি ?

—কিন্তু প্রেম ?

ফারুক বলল, প্রেম কি কখনো হারাবার জিনিষ। আমার যা প্রাপ্য কেউ কেড়ে নিতে পারে ?

—তবু· । কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন বাদশা।

বাধা দিল ফারুকউন্নিসা। এর মধ্যে কিন্তু নেই। বহু বিবাহ মুসলমান, বিশেষ করে মোগল বাদশাদের মধ্যে নতুন নয়। আপনি বিবাহ করুন।

—তুমিও।

ফারুক বলল, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আমাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে বৈকি।

বাদশা এবার গভীর চোখে তাকালেন বেগমের দিকে। দেখতে চাইলেন সত্যি কি এটা তবে অন্তরের কথা। বললেন, তোমার অন্তর থেকে বলছ এ কথা?

স্বামীর অনেকটা কাছে এলো ফারুক। দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মন, মনেই থাক। আপনি কি আমার মনকে জানেন না। এ প্রশ্ন কেন? কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তো ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করতেই হবে, বিশেষ করে সে যদি আপনার মঙ্গলের জন্য হয়। আর তাছাড়া আমির-ওমরাকে তো আপনি জানেন, এ বিবাহ যখন তিনি ঠিক করেছেন, অস্বীকার করলে খারাপ হতে পারে। শক্তি সঞ্চয় না করে হুসেন আলীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান উচিৎ নয়।

বাদশা কোন উত্তর দিলেন না, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে শুধু পত্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন

ফারুক সোহাগে স্বামীর দেহে হাত রেখে বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমি তাকে নিজের বোনের মত গ্রহণ করব।

শুধু ক্লিষ্ট ভাবে একটু হাসলেন ফররুকসিয়র।

এগার

সমস্ত দিল্লী নগরী আজ উৎসব শিবিরে পরিণত হয়েছে

বাদশার সাদি।

যোধপুর থেকে কন্যা নিয়ে আসছেন বাদশার মামা শায়েস্তা খাঁ। আনন্দ আর ধরেনা।

অনেক দিন এমন বিবাহ অনুষ্ঠান আর হয়নি।

বিবাহের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন কুতুবউলমুলক আবদুল্লা খান।

উজীর ওমরাও কেউ রেহাই পাননি। বাজারে বেরিয়েছে। ক্রেতার সঙ্গে ব্যবসায়ীর ভীড়।

বিক্রেতা আর ক্রেতার মধ্যে আজ প্রতিযোগিতা।

সমস্ত বাজারটাই যেন জলসা ঘরে পরিণত হয়েছে।

একি বাঈজি মহল কিংবা বাজার, আজকে বুঝে উঠা দায়।

রাজস্থানী ধাচের গহনা চাই রাজনন্দিনীর জন্য, কামিজ কোর্তা ছাড়া ঘাঘরাও কিনতে হবে।

রাজপুত মেয়ের পরিচ্ছদ কিনতে গিয়ে রীতিমত হিমসিম খাবার উপক্রম। কত রং বেরংয়ের জিনিস এসেছে।

বাদশার সাদি, দেশ বিদেশ থেকে বণিকরা এসেছে ছুটে। কাবল, পারস্য, কাশ্মীর থেকে বাদকেরা গালিচা আর কিংখাপ এনেছে।

ঢাকা থেকে সওদাগরেরা এনেছে মসলিন।

এমন কি হিন্দু বাদকেরা কাশী থেকে বেনারসী এনেছে।

কুতুবউলমুলক আজ দিলদরিয়া।

দুহাতে খরচ করছেন তিনি।

ওদিকে হয়তো রাজস্থানেও তখন বিবাহ প্রস্তুতি উঠেছিল দিল্লীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

মহারাজ অজিত সিংহও তো দুর্বল রাজপুত্র নন।

নিজের মর্য্যাদা রাখবার জন্যই তাঁকে এগুতে হবে।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে। সেপ্টেম্বর মাস। বর্ষাকাল।

সমস্ত দেশের উপর দিয়ে সবুজ সমারোহ। পৃথিবীও যেন বাদশার

সাদিতে আনন্দ উৎসবে যোগ দিয়েছে। বৃষ্টি ধৌত রাজধানী স্নিগ্ধ হয়েছে।

এমনি দিনে রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী যোধপুর কন্যা রায় ইন্দর কুনয়ারকে পাল্কী করে দিল্লী নিয়ে এলেন সায়েস্তা খান। ওঃ, সেকি আনন্দ! উল্লাসে যেন দিল্লী ফেটে পড়ল।

সহস্র উল্লাসধ্বনীর মধ্য দিয়ে আমির-উল্-ওমরার প্রাসাদের দিকে এগিয়ে এলেন কন্যা।

বেগমরা এসে দেখে গেলেন।

রাজধানীর রূপসীরা এসে কন্যার রূপের তারিফ করলেন।

সকলের মুখে এক কথা, এমন রূপ আর হয় না।

কনের রূপে আর্শী মহল ম্লান হবে।

বাদশার সঙ্গে আদর্শ বিভার মিলন হবে যেন।

ইসলামে দীক্ষিত করা হ'ল কন্যাকে।

কাজীর সামনে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ল।

কুতুব উল্‌মুলকের সুপারিশে কনের জন্য বাদশা দিলেন একশ আসরফি উপহার।

এবার বাকী রইল বরপক্ষের কন্যার গৃহে যাওয়া।

সেটাও হবে, কিন্তু বাধা পড়ল।

বাধা পড়ল কারণ, যাকে কেন্দ্র করে এই আনন্দ অনুষ্ঠান সেই বাদশা স্বয়ং সন্তুষ্ট নন।

যেদিন প্রথম তিনি এ সংবাদ পেয়েছেন, সেদিন থেকেই বিমর্ষ তিনি।

নতুন বেগম ঘরে আনতে প্রস্তুত নন বাদশা।

প্রস্তুত নন নানা কারণে।

এ তাঁর পরাজয়, এ তার প্রেমের অবমাননা।

মনের উপর অত্যধিক চাপ পড়ল যেন তরুণ বাদশার।

তাঁর দেবপুত্রের মত দেহ, দিনের পর দিন মলিন হয়ে যেতে লাগল। সামান্য অসুখ ছিল বাদশার। অর্শ।

কিন্তু চিন্তায়, চিন্তায় তা বেড়ে ভীষণ হয়ে উঠল।

শয্যাশায়ী হ'লেন বাদশা।

কন্যার বাড়ী যাওয়া স্থগিত থাকল।

নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে লাগলেন বাদশা।

সূর্য্যের আলোর মত যে আনন্দ, তার উপর যেন সহসা মেঘের ছায়া এসে পড়ল।

উৎসবমুখর দিল্লী নগরী আবার হ'ল বিমর্ষ।

বিষম চিন্তায় পড়লেন আমীর-উল্-ওম্‌রা।

কুতুব উল্‌মুল্‌ক, গালে হাত দিয়ে বসলেন।

হেকিম বৈদ্য, হিন্দুস্থানের যেখানে যা ছিল তলব করা হ'ল। আপ্রাণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন সবাই. না. সম্ভব নয়।

তবে উপায় ?

ঠিক সেই মুহূর্তে নতুন ইতিহাসের সূচনা হ'ল ভারতবর্ষে।

ইংরেজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে প্রতিনীধিদল বানিজ্যিক সুবিধার জন্য দরবার করতে এসেছে বাদশা সমীপে।

নেতৃত্ব করছেন জন সারম্যান।

তার সুযোগ্য সহকারী হিসেবে রয়েছেন ইংরেজ ডাক্তার উইলিয়াম হ্যামিলটন।

বাদশার সঙ্গে দেখা নেই।

কাজ দিনের পর দিন বিলম্বিত হচ্ছে।

কারণ জিজ্ঞেস করতে জানা গেল বাদশা অসুস্থ।

ভয়ানক অসুস্থ, অসুখ সারছে না।

আমীর-উল-ওমরাকে তাই জানালেন একদিন বৃটিশ দূত—

—কি ব্যাধি বাদশার, আমরা একদিন দেখতে পারি কি ?

—তুমি কি চিকিৎসা জান ? জিজ্ঞেস করলেন আমির।

সারম্যান বললেন. আমার সঙ্গে একজন বড় ডাক্তার আছেন উইলিয়ম হ্যামিলটন। তাকে দেখাতে পারেন।

ডুবন্ত মানুষের কাছে, খড়ও আশ্রয়।

সবাই যখন ব্যর্থ হয়েছেন তখন দেখালে মন্দ কি ?

—বেশ দেখতে পারে। অনুমতি দিলেন আমীর। বললেন, যদি ভাল করতে পার, প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।

বাদশাকে দেখলেন ডাক্তার। বললেন তিনি এ চিকিৎসা করতে পারবেন। তবে সময় লাগবে দুমাস। বাদশা সুস্থ হবেন।

মেঘের ফাঁকে যেন চন্দ্র উকি দিল। আবার হাসি ফুটল সকলের মুখে। চিকিৎসা চলল পুরো দুমাস।

অবশেষে বাদশা ভাল হলেন।

হ্যামিলটন তাকে নতুন জীবন দিয়েছেন। বাদশা কৃতজ্ঞ তার কাছে। বললেন, হেকিম বল কি চাই তোমার।

সে এক আশ্চর্য্য হেকিম।

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়। ব্যক্তির জন্য কিছুই চাইলেন না হেকিম। বললেন, ইওর ম্যাজেষ্টি, যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে সারম্যানের প্রার্থনা আপনি পূরণ করুন।

বাদশা বললেন, সেত হবেই। সেত আলাদা। তোমার ব্যক্তিগত কি চাই বল ?

হ্যামিলটন বললেন, ইওর ম্যাজেষ্টি, জাতির প্রশ্নে আমাদের মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। সারম্যানের প্রার্থনা পূরণ হলেই আমি আমার প্রাপ্য পাব।

তবুও বাদশা পেড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু কিছুতেই রাজি হলেন না হ্যামিলটন।

অগত্যা বাদশা সারম্যানকে ডাকলেন, বল কি চাই তোমার কোম্পানীর জন্য ?

কুর্নীস জানিয়ে সারম্যান বললেন, ইওর ম্যাজেষ্টি—আমরা বাণিজ্য করতে এসেছি। কিন্তু হিন্দুস্তানে থাকবার জায়গা পাচ্ছিনা কোথাও। বাদশা যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে আমাদের বাণিজ্য

করবার সুযোগ দিন এটাই আমাদের প্রার্থনা। আপনি ফরমাস দিন যাতে সুতানুটি গোবিন্দপুর আর মাদ্রাজের কাছে কিছু স্থান আমরা কিনে নিয়ে বসতি করতে পারি। তার আপনার সাম্রাজ্যে যে কোন স্থানে ব্যবসা করতে পারি। যদি ইওর ম্যাজেষ্টি ইচ্ছে করেন তবে বাঙলাতে আমাদের শুল্কহীন বাণিজ্য করবার অধিকার দিন। প্রতিবছর আমরা তার জন্য তিন হাজার টাকা দেব। আর সুরাট থেকেও আমাদের কাষ্টম ডিউটি উঠিয়ে নিতে হবে—আমরা শুধু বছরে দশ হাজার টাকা আপনার দেওয়ানীকে দেব।

আরো কিছু চাইবার আছে, যদি ইওর মাজেষ্টি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে বোম্বাই মিণ্ট থেকে আমাদের টাকা তৈরীর অনুমতি দিন। বাদশার কাছে আর আমাদের কিছু চাইবার নেই।

রোগ মুক্ত হয়ে বাদশা তখন নিতান্তই সন্তুষ্ট ছিলেন সারম্যান দৌত্যের উপর।

অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে তিনি তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

শুধু প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন না, এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করলেন।

রোগমুক্ত হলেন বাদশা!

এবার আবার সাদির কথা উঠল।

আবার দিল্লী আনন্দ মুখরিত হ'ল।

দুমাস পর বিয়ের জন্য নতুন তোড়জোড় চলল।

হেনা পর্ব।

বাদশার যোগ্য উপহার পাঠানো হোল কনের কাছে।

দামী দামী ধনরত্ন, অভূতপূর্ব উপহার পাঠানো হ'ল।

ইতিপূর্বে অমনটি আর নাকি হয়নি কখনো।

আমির-ওমরাহেরা, তাঁদের বেগমরা, বান্দা বাঁদীরা ভীড় করে দেখলেন সে উপহার।

এমনটি আর হয় না, তারিফ করলেন সকলে।
অবশেষে লৌকিকতা শেষ হ'ল।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দ। ১৭ই ডিসেম্বর।
লালকেল্লা থেকে মিছিল নিয়ে বাদশা গেলেন কনে আনতে।
ঝিকমিক করছেন লালবাদশা নতুন পোষাকে।
দুলে দুলে চলছে তার তাঞ্জাম।
আতশ বাজির ছড়াছড়ি।
আগুনের ফুলকি-হারে আসমান ছেয়ে গিয়েছে।
তাঞ্জামের পাশে চলেছে লাঠিয়াল, তারপর পেশাদার বাঈজীরা।
মণ মণ আতরে যেন দুনিয়া বেহেস্ত হয়ে গিয়েছে।
ঠায় ঠমক নিয়ে বর এলেন আমীর-উল-ওমরার বাড়ীতে।
মহারাজ অজিত সিং আর কুতুব্ উলমুল্‌ক আবদুল্লা খান অভ্যর্থনা জানালেন বাদশাকে।
বিবাহ আরম্ভ হ'ল।
আচারপর্ব শেষ।
যোধপুরাধিপতি তার উপহার মেলে ধরলেন বাদশার সামনে।
প্রকাণ্ড এক বড় সোনার থালা।
পাঁচটি বাটিতে পাঁচটি মূল্যবান পাথর।
তার মধ্যে রয়েছে অপরূপ এক পান্না।
তার দ্যুতিতে যেন ঘর ভরে গেল।
মোগল বাদশার বিবাহে এ উপহার আর আসেনি কখনো।
একবাক্যে প্রশংসা করল সবাই।
কিন্তু······
হয়তো ঐ পান্নার মধ্যে ছিল নীলদ্যুতি।
অন্ততঃ বাদশার চোখে তা ধরা পড়েছিল।
সেই উপহার গ্রহণের সময় হাতটা কেঁপে গিয়েছিল তাঁর।

পান্নার জন্য যে মূল্য তাকে দিতে হচ্ছে তার কখনো বিনিময় হয় না।

কিন্তু নীরবে গ্রহণ করলেন তিনি উপহার।

মনে হ'ল এক নীল বিষ যেন গ্রহণ করলেন তিনি। কিন্তু মুখে তবু এক প্রফুল্ল ভাব টেনে রাখলেন।

উপহার আর কন্যা দুই নিয়ে অবশেষে তিনি আবার লালকেল্লায় ফিরে এলেন।

যে মুহূর্তে দিল্লীর পথে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য সেই মুহূর্তে বাঙলায় কিন্তু এক বিষাদের ছায়া।

বিষাদের ছায়া বাঙলার নবাবের গৃহে।

বিষাদের ছায়া বাঙলার ভবিষ্যতে।

নবাবের চেয়ে সাধারণ মানুষের জীবন সুখের; বাঙলার বৃদ্ধ সুবেদার যেন এ-কথাই বার বার অনুভব করছিলেন।

নবাবীর প্রথম অভিশাপ তার বিলাস, তার লাম্পট্য।

দ্বিতীয় অভিশাপ, তার দায়িত্ব, দায়িত্বের জন্য সংগ্রাম।

সামান্য অবস্থা থেকে একটা প্রদেশের ভাগ্য বিধাতা হয়েছেন মুর্শিদ খাঁ।

একটা প্রদেশের হর্তাকর্তা তিনি।

কিন্তু জীবনে সুখ নেই তাঁর।

একমাত্র ছেলেকে তিনি ধর্মযুদ্ধে হারিয়েছেন।

আর একমাত্র কন্যা জিন্নেতুন্নেসা।

তাকে বিবাহ দিয়ে জামাতার মধ্যে পুত্র পেতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু নবাবের ঐশ্বর্য তার বাদ সেঁধেছে।

সুজাউদ্দিন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন বিলাসের মধ্যে।

মদ আর বাঈজী আজ তার জীবনের উদ্দেশ্য।

স্ত্রীকে অস্বীকার করেছেন তিনি।

তালাক না দিলেও স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নেই তাঁদের।

তার এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে সহ্য করতে না পেরে মুর্শিদকুলি খাঁ তাকে উড়িষ্যায় পাঠিয়েছেন।

জিন্নেতুন্নেসা তার একমাত্র স্নেহের কন্যা হয়েও একা।

নবাবী, তার ঐশ্বর্য, তার প্রতিপত্তি কিছুরই তার কন্যার জন্য সুখ আনতে পারেনি।

ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার।

বৃদ্ধ হয়ে আসছেন তিনি, তারপর কে দায়িত্ব গ্রহণ করবে বাঙলায়?

বাঙলাকে তিনি প্রকৃতপক্ষে মোগল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র করে গড়তে চেয়েছেন।

পেরেছেনও তিনি।

কিন্তু তারপর, কে গ্রহণ করবে সে দায়িত্ব!

একমাত্র জামাতা, সে অক্ষম, তার তরফ থেকে কোন আশা নেই।

অথচ বৃদ্ধ সুবেদার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্থান ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্ন সুবা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করছে।

সে সুযোগ বাঙলারও হ'তে কিছু হবে না। অন্য কেউ হয়তো তাঁর হাতে-গড়া বাঙলাকে ছিনিয়ে নেবে

বাঙলার ভবিষ্যৎ ভেবে বৃদ্ধ সুবেদারের আজ বিষাদ।

তার এক বিষাদ তার রাজনৈতিক।

ঔরংজীবের পর থেকেই বাদশাহীতে দুবলতা দেখা দিয়েছে।

জাতিবিরোধ বাদশাকে যেমন দুর্বল করেছে, তেমনি বাঙলাকেও করেছে বিপর্যস্ত।

মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত সুবার মধ্যে বাঙলাই বুঝি উর্বরতম।

প্রত্যেকেরই লক্ষ্য বাঙলা।

ফররুকসিয়রই ঘটিয়েছেন সবাপেক্ষা বিপদ।

পাটনা থেকে তিনি জাহান্দার শার জীবিতকালে বাঙলার রাজস্ব দাবী করে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন তা আজো যায় নি।

সে দিনই মুর্শিদকুলি খাঁ মোগল সাম্রাজ্যের সর্বনাশের কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন এবং মনে মনে স্বাধীন হবার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। আজ তার বৈরীপুত্র ফর্‌রুকসিয়র দিল্লীর মসনদ পেয়েছেন।

তাকে পদচ্যুত করবার চেষ্টা সে প্রথমেই করবে। দিল্লীর অক্রামণ থেকে নিজেকে রক্ষা করাই তখন তার সমস্যা।

পাটনা থাকাকালীন তিনি ফর্‌রুকসিয়রকে অস্বীকার করেছিলেন এই বলে যে দিল্লীর মসনদে না বসলে তিনি কাউকে বাদশা বলে মানেন না। আজ ফর্‌রুকসিয়র দিল্লীর মসনদে। বাদশা বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। আবার স্বীকার করলেও বিপদ। একথা নিশ্চিত যে ফর্‌রুকসিয়র তাকে প্রথম সুযোগে পদচ্যুত করবেন।

এই সমস্ত বিপদের উপর আর এক বিপদের সৃষ্টি করেছেন তিনি সারম্যানকে বাদশাহী ফারমান দিয়ে বাঙলাতে শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্য অধিকার দিয়ে।

প্রকৃতপক্ষে মুর্শিদকুলি খাঁর জন্যই হয়তো এরকম করেছেন বাদশা।

ফর্‌রুকসিয়র জানেন, যে মুর্শিদকুলি খাঁ এ ফারমান মেনে নেবেন না। কারণ মেনে নিলে বাঙলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙে যাবে, বাঙলা ভিখিরী হবে।

আবার বাদশার ফারমান না মেনে নিলে সংঘাত অনিবার্য।

এ সংঘাত হয়তো তার জীবদ্দশায় বাঙলার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু তারপর?

তারপর কে নেবে এ বাঙলার দায়িত্ব?

সেই ভবিষ্যৎ ভেবেই আজ ম্রিয়মান বৃদ্ধ সুবেদার।

শেষ বয়সে এখন তার একমাত্র বন্ধু, সঙ্গী, মন্ত্রী যা বল সব তার কন্যা জিন্নেতুন্নেসা বেগম।

যে কোন সমস্যায় পড়লে তিনি হারেমে কন্যার কাছেই আসেন সর্বপ্রথম।

আজো তিনি এসেছেন।

বৃদ্ধ পিতার ক্লান্ত মুখ দেখেই বুঝেছেন কন্যা যে, কিছু একটা ঘটেছে।

তাই জিজ্ঞেস করলেন তিনি, কি হয়েছে আব্বাজানের? এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন আপনাকে?

উত্তর দিলেন বৃদ্ধ। একটা স্পষ্ট ক্লান্তির সুর তাঁর কণ্ঠে, বাঙলার কথা ভেবে ক্লান্ত হয়েছি মা।

—কেন?

—মোগল সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। প্রত্যেকটি সুবা স্বতন্ত্র স্বাধীন হবে, কিন্তু বাঙলা?

বুদ্ধিমতি কন্যা তখনি বুঝতে পারলেন, পিতা কি বলতে চান, বললেন, কেন, বাঙলাও স্বাধীন হবে!

বার

বিবাহ শেষে বাদশা ফিরে এলেন।

কন্যা নিয়েই ফিরে এলেন।

কিন্তু নতুন বেগমের গৃহে তখনি গেলেন না।

হারেমে প্রথম এলেন তিনি প্রিয়তমা পত্নী ফারুকউন্নিসার কাছেই।

রাজপুত তনয়ার সঙ্গে সাদি কি ভাবে গ্রহণ করেছে ফারুক সেই জানে। কিন্তু তাকে দেখে তার অন্তরের কথা কিছুই বোঝা গেল না।

কিন্তু বাদশা যে অনুতপ্ত ফারুকউন্নিসারই জন্য, তা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু দিল্লীর বাদশা হয়েও তিনি অসহায়।

তাঁর শক্তি সে শুধু বাইরে।

গৃহে তিনি বন্দী। আমিরদের হাতে তিনি খেলনা।

ব্যক্তিসত্বা নেই তাঁর, তিনি প্রতীক।

অন্ততঃ ফররুসিয়রের কাছে এ বাদশাহীতে সুখ নেই আর।

সুখ নেই, তাই তিনি ম্রিয়মান।

তার সেই মলিনতা প্রথমেই চোখে পড়ল ফারুকের। সে বলল, —একি আপনাকে এত বিষন্ন দেখাচ্ছে কেন?

বাদশা কোন কথা না বলে শুধু তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে।

ফারুক বলল, নতুন সাদি করেছেন, এসময় ম্রিয়মান থাকতে আছে?

প্রথম কথা ফুটল বাদশার। বললেন, তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ?

স্বামীর আরো কাছে এসে বলল ফারুক, না জাহাপনা।

বাদশা বললেন, তবে নতুন সাদির পর আমি যে সুখী হ'ব এ ধারনা তোমার কি করে হল?

ব্যথা পেয়ে যেন ফারুকউন্নিসাও তাকাল স্বামীর দিকে। বলল, আমি সে অর্থে কিছু বলিনি জাহাপনা। আপনার কর্তব্যের কথাই তখন বলছিলাম শুধু। রাঠোর নন্দিনীতো কোন দোষ করেনি। সুতরাং তাকে অবজ্ঞা করবার কোন প্রশ্ন আসে না। আপনার এখন সেখানেই যাওয়া উচিৎ ছিল।

বাদশা বললেন, রায় ইন্দর কুনয়ার এখন আমার বিবাহিতা বেগম। তিনি এখন বাদশার বেগম। কিন্তু ফররুকসিয়রের বেগম নন। মোগল হারেমে তার অসম্মান হবে না। বেগমের মর্য্যাদাও পাবেন। অন্যান্য বেগমরা বাদশাকে যেভাবে পান তিনিও পাবেন। বাদশা হারেমের এ রীতি তো তার অজ্ঞাত নয়—বাদশা এখন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়েছেন, তিনিও তেমনি রাজনৈতিক কারণে নিজেকে বলি দিয়েছেন। সুতরাং—

গর্ববোধই হ'ল ফারুকউন্নিসার। মনে মনে তিনি সন্তুষ্টই হলেন।

শুনেছেন রায় ইন্দর কুনয়ার সুন্দরী। অপূর্ব সুন্দরী।

কিন্তু সৌন্দর্য বাদশাকে আকর্ষণ করতে পারেনি।

হৃদয় দেহের চেয়ে বড় হয়েছে।

প্রেম জয়লাভ করেছে। বাদশা তার হারেমে এসেছেন, এটা গর্বের কথা বৈকি।

কিন্তু ফারুকউন্নিসা ভিন্ন চরিত্রের নারী।

তার কাছে প্রেমের চেয়ে স্বামী বড়।

ভালবাসার চেয়ে কর্ত্তব্য বড়।

সে যদি শুধুমাত্র ফর্রুকসিয়রের বেগম থাকত, নিজেকে নিশ্চয়ই সে উপভোগ করতো। হয়তো ঈর্ষাও করতো নতুন বেগমকে।

কিন্তু আজ সে সম্রাজ্ঞি, বাদশা-বেগম।

বাদশার মত তারও নতুন জন্ম!

আজ তারা সবাই প্রতীক।

ব্যক্তিত্বের স্থান নেই বাদশাহীর মধ্যে। সমষ্টির মধ্যে নিজের সত্বাকে হারিয়ে ফেলতে হবে।

উপভোগে বাদশার মৃত্যু। দায়িত্ব সম্পাদনে তার সার্থকতা।

দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে অস্বীকার করতে সে রাজি নয়।

সুতরাং আজ তার সমস্ত ভাবনা অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেখানে ফারুকউন্নিসার কোন স্থান নেই। সেখানে বাদশার বেগম তিনি।

এখানে তার সমস্ত কিছু কর্ত্তব্যদ্বারা পরিচালিত, আবেগদ্বারা নয়। সুতরাং স্বামীকে সে বলল, একথা স্বীকার করছি জাহাপনা যে আত্মবিসর্জন দিয়েই এখানে এসেছি। আমিও আপনাকে আত্মার কোন প্রশ্ন নিয়ে কাজ করতে বলছি না। দায়িত্ববোধ থেকে কাজ করতে বলছি। ব্যক্তির জন্য না হোক, সমষ্টির জন্য আপনার রায় ইন্দর কুনয়ারের কাছে যাওয়া উচিৎ।

—কি রকম? প্রশ্ন করলেন বাদশা।

ফারুকউন্নিসা বলল, আপনি এ সাদিতে মত দিয়েছিলেন কেন?

—রাষ্ট্রের স্বার্থে।

—রাজপুত রাজার সঙ্গে মিত্রতা করে নিজেকে শক্তিশালী করতে এইতো?

—হ্যাঁ।

ফারুক বলল, সুতরাং সেই মিত্রতা দৃঢ় করতে হ'লে রাঠোর নন্দিনীকে সন্তুষ্ট করতে হবে বৈকি। মনের দিক থেকে না হোক মানের দিক থেকে সে প্রয়োজন আছে। ইন্দর কুনয়ারের মর্যাদার জন্য অন্ততঃ আপনার তার কাছে যাবার প্রয়োজন আছে।

একটু ক্লান্ত ভাবে বাদশা বললেন, হয়তো আছে। কিন্তু জান।

—কি ? প্রশ্নের ভঙ্গিতে ফারুকউন্নিসা স্বামীর দিকে তাকাল।

বাদশা বললেন, সাদির রাত্রে আমি মহারাজ অজিত সিংহকে প্রথম দেখলাম। মানুষ চেনবার যদি আমার এতটুকু ক্ষমতা থেকে থাকে, তবে বলছি শোন। একমাত্র নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কারো স্বার্থ দেখতে তিনি রাজি নন। কন্যার প্রতি তাঁর মমতা নিতান্ত অল্প।

একটু থামলেন তিনি, ফারুক কোন কথা বলল না।

আবার বাদশা বললেন, রায় ইন্দর কুনয়ারের জন্য দুঃখ হয়। তাকে আমি যোগ্য মর্যাদা দিলেও পিতার মনোস্তুষ্টি হবে কিনা সে বিষয়ে প্রচুর সন্দেহ আছে।

ফারুক বলল, যে দিক দিয়ে বিচার করে আপনাকে যেতে বলছি না। কিন্তু জানবেন যে লোকের মন নেই, তারও মান বোধ আছে। তার কন্যাকে আপনি ভালবাসছেন এটা নিয়ে মাথা না ঘামালেও তাকে মর্যাদা দিয়ে যোধপুরকেই মর্যাদা দিচ্ছেন কিনা এটা নিশ্চিত লক্ষ্য রাখবেন তিনি। সুতরাং সেই কুটনীতির দিকটা বিবেচনা করেই আপনাকে যেতে হবে।

বাদশা বললেন, তুমি শুধু আমার বেগম নও, তুমি আমার মন্ত্রীও। তোমার কথা নিশ্চয়ই শুনব আমি। কিন্তু···

—কিন্তু কি ?

বাদশার দুচোখে যেন একটা শঙ্কা ফুটে উঠল। বললেন জান, সাদির রাত্রে মহারাজ যে পান্না উপহার দিয়েছিলেন তা দেখে চমকে উঠেছিলাম আমি!

—কেন ?

—সে পান্নার মধ্যে ছিল নীলদ্যুতি।

—নীলদ্যুতি ! সে কি ! আপনি ভুল দেখেছিলেন জাহাপনা।

একটু যেন জোর দিয়েই বললেন বাদশা, না, না, আমি ঠিকই দেখেছি, নীলদ্যুতিই দেখেছি। ও পান্না আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

ফারুকউন্নিসার মধ্যে চিরন্তন নারী কেন যেন সে অমঙ্গলের ইঙ্গিতে চমকে উঠল। সে প্রতিবাদ করে উঠল, না, না খোদাবন্দ আপনি ওকথা বলবেন না। খোদাতালা সবারই মঙ্গল করবেন।

স্নেহের রসে সিক্ত কেমন একটা কৌতুকের দৃষ্টি মেলে বাদশা সে দিকে তাকিয়ে থাকলেন

বাদশা যখন বাদশা, বেগম তখন বেগম।

হৃদয় না থাক রীতি আছে।

মানুষকে যেমন হৃদয় মেনে চলতে হয়, বাদশাকে তেমন রীতি মেনে চলতেই হবে।

বাদশা হল বৈদিক জীব।

সেই রীতি রাখার জন্যই বাদশা এসেছেন নবপরিণীতা স্ত্রী রায় ইন্দর কুনবারের কক্ষে।

বাসর-কক্ষে বাদশা তেমনি ভাবে লক্ষ্য করতে পারেননি রাঠোর নন্দিনীকে।

নির্জনে আজকে তিনি যেন প্রথম দেখলেন তাকে।

রায় ইন্দর কুনয়ার সুন্দরী।

তীব্র গৌরবর্ণ।

শক্ত দেহের বাধন, লাবণ্যের চেয়ে শক্তি সেখানে বেশী। ঘন চুলটির দীর্ঘ বেণী যেন একটি চাবুক। আয়ত চোখ। কিন্তু দৃষ্টিতে

বাঙলার কোমনীয়তা নেই। জীবন সম্বন্ধে তীব্র আগ্রহ, প্রেম সম্বন্ধে গভীর ধারণা সেখানে আছে কিনা বোঝা দায়।

কিন্তু যে কোন মুহূর্তে এই সমস্ত নারীসত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করে অগ্নি প্রজ্বলিত হতে পারে বেশ বোঝা যায়।

অগ্নিরূপা কন্যা।

আফগান আর মোগল কন্যাদের সঙ্গে কোথায় একটা সামঞ্জস্যও আছে। তাই ধন্য ধন্য করেছিল সমস্ত রাজধানী।

একবাক্যে রূপের প্রশংসা করেছিল সকলে, কারণ রূপ নয়, এক খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার রায় ইন্দর কুনয়ার।

বাদশা সেই অগ্নিদ্যুতি-কন্যার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

সু-পুরুষ বাদশা নিজেও।

তার বীরত্ব-ব্যঞ্জক চেহারা। সাতফুট দীর্ঘ দেহ। বিস্তৃত বক্ষ

সমস্ত হিন্দুস্থানে অতবড় সু-পুরুষ নেই।

রাঠোর নন্দিনী তাঁর দিকে তাকাল।

পুরুষ যদি পুরুষ হয়, তবে নারী চিরকাল নারী।

সেই অগ্নিবর্ণা কন্যার নারীসত্ত্বার তন্ত্রীতে তাই ঝঙ্কার উঠল যেন। নিজের স্বরূপকে যেন আবিস্কার করতে পারল রায় ইন্দর কুনয়ার। সেই মুহূর্তে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে কিসের এক লজ্জা ফুটে উঠতে লাগল যেন।

ভাল লাগল বাদশারও।

তিনি এগিয়ে গিয়ে রাঠোর নন্দিনীর পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর দুটি বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে স্পর্শ করলেন সেই বরতনু।

একটু কেঁপে উঠল রায় ইন্দর কুনয়ার।

—বাদশা ডাকলেন, ইন্দর।

তার আয়ত দুটি চোখ তুলে ইন্দর তাকাল বাদশার দিকে।

চিরকাল মানুষের নারীর প্রতি যা প্রশ্ন, বাদশাও সেই প্রশ্ন করলেন, ভাল লেগেছে আমাকে ?—

চিরকাল নারীর যা উত্তর তাই দিলেন ইন্দর। শুধু লজ্জাবনত ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করে স্বীকার করলেন, হ্যাঁ।

বাদশা বললেন, মোগল বাদশা বহু-পত্নীক, এ কথা জেনে তোমার দুঃখ হবে না?

প্রথম কথা বলল রাজকুমারী। বলল, রাজপুতরাও একদার নন।

—তোমার কাছে যে আমি এতক্ষণ আসতে পারিনি তার জন্য অভিমান হয়েছে তোমার?

একটু তাকিয়ে দেখল ফর্‌রুকসিয়রকে রাথ ইন্দর কুনয়ার। তারপর বলল,—আমি তা জানি জাহাপনা।

—কি জান?

—আপনি বাদশা। আপনার অনেক কাজ। বেগমের মনোরঞ্জন করা আপনাদের সব সময় সম্ভব নয়। আমাদের জীবনও যে বিলাসের জন্য নয়, এ শিক্ষাও আমরা পেয়েছি। আমাদের ব্যক্তিসত্তা নেই একথাও আমরা জেনেছি জনাব।

ভাল লাগল বাদশার। দেখলেন মোটেই দুর্বল নয় রাঠোরকন্যা। রাজকন্যার যোগ্যই বটে। বললেন, একটা প্রশ্ন করব?

—বলুন।

—এই মুহূর্তে তোমার সবচেয়ে আপন কে?

একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকল ইন্দর স্বামীর মুখের দিকে। তারপর বলল, এ প্রশ্ন কেন জাহাপনা?

বাদশা বললেন, ধর এমনি।

ইন্দর বলল, আপনি কি রাজপুত রমণীদের কথা শোনেননি? আপনি কি জানেন না যে স্বামী ছাড়া তাদের অন্য কোন ধারনা নেই? তাদের জীবন মরণ সমস্তই স্বামী।

—যদি আমি কখনো তোমাকে অনাদর করি?

—অনাদর করলেও স্বামী স্বামীই। অন্য কোন কথা আমরা শিখিনি খোদাবন্দ।

ফর্‌রুকসিয়র বললেন, আমার জন্য প্রয়োজন হ'লে কি করতে পার তুমি ?

একটু ব্যথা পেল যেন ইন্দর। বলল, আপনার জন্য প্রয়োজন হ'লে যুদ্ধ করতে পারি। প্রয়োজন হ'লে আত্মবিসর্জন দিতে পারি। 'আপনিই' যে 'আমি' বাদশা।

শেষ কথাটি যেন বড় মধুর মনে হ'ল। বাদশা আবেগে যেন একটু কাছে টানলেন ইন্দরকে !

—একটা প্রশ্ন করতে পারি ?—বাদশা বললেন।

—বলুন, অকলঙ্ক দুটি চোখে ইন্দর তাকাল বাদশার দিকে।

বাদশা বললেন, তোমার বাবাকে তোমার কেমন মনে হয়।

—এ প্রশ্ন কেন খোদাবন্দ।

—তোমার বাবাকি প্রয়োজন হ'লে তোমার জন্য সব কিছুই করতে পারেন ?

ইন্দর বলল, জাহাপনা, আজ আপনি আমার স্বামী ;—সুতরাং আপনার কাছে কিছু গোপন রাখা অন্যায়। যা জানি বলছি। আমার বাবা নিজের স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই বোঝেন না। যে দিন তিনি বিবাহ দিয়েছেন সেদিন আমি তার কাছে পর হয়ে গেছি।

পান্নার সেই দ্যুতির কথাটা মনে পড়ল বাদশার।

অজিত সিংহের চোখে মুখেও কিসের একটা নিষ্ঠুর আলো দেখতে পেয়েছিলেন তিনি।

বাদশাঁ যেন আর কোন কথা বলতে পারলেন না।

কিন্তু তাকে নীরব থাকতে দেখে ভয় পেল বুঝি ইন্দর। বলল খোদাবন্দ, আমার পিতা যাই হোক আমি তো আপনার ? প্রয়োজন হ'লে পিতার বিরুদ্ধেও আমি আপনার জন্য অস্ত্র ধারণ করতে পারি।

কি নিস্পাপ রমণী, ভাবলেন ফর্‌রুকসিয়র।

তাকালেন তিনি কুনয়ারের দিকে। সত্যি নিষ্কলঙ্ক দুটি অকৃত্রিম চোখ।

ব্যথা দিতে ইচ্ছে হ'ল না তাকে। বাদশা আবেগে টেনে নিলেন তাকে। বললেন, আমি তা জানি ইন্দর, আমি তা জানি।

রায় ইন্দর কুনয়ার সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পন করল বাদশার বিস্তৃত বক্ষের মধ্যে। বাদশা আবার তাকে ছেড়ে দিলেন। এবার তাঁকে যেতে হবে দরবারে, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।

দরবারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কি নিয়ে?

প্রথমত মহারাজ অজিত সিং আজ দরবারে স্থান পাচ্ছেন, তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করতে হবে।

রাজপুতানার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হবার পথে চলেছিল, তা আবার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

তা ছাড়া রাজস্ব-নীতি ধার্য করবার জন্য নতুন করে বিবেচনার প্রয়োজন।

ঔরংজীবের পর সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বনিয়াদ একরকম ভেঙ্গে গেছে বললেই হয়।

ফররুকসিয়র পাটনা থাকাকালীন বাঙলার সুবেদার মুর্শিদকুলি খান তাকে বাদশা বলে নজরানা পাঠায়নি।

এবার শাহজাদা দিল্লীর গদিতে আসীন।

বাঙলার শাসন ব্যাপারের কোন পরিবর্তন হবে কিনা সেটাও বিবেচনার বিষয়।

হয়তো বা সঈদ ভাইয়েরা সেই দিকেই মত দেবেন।

দরবারে সে প্রস্তাব উঠলে সে মতে বাদশাও মত দেবেন কিনা সেটা ভাববার বিষয়।

দিনে দিনে তাদের ব্যবহার এতটা স্বাধীন হয়ে উঠছে যে তাদের সম্বন্ধে সাবধান হবার সময় হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে হুসেন আলীর রাজপুতানা অভিযান বাদশাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

অজিত সিংহের সঙ্গে বাদশার এই বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে বাদশার পরাজয়েরই নামান্তর।

তাই দরবার আজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাদশা সেই চিন্তাতে আচ্ছন্ন হয়েই রায় ইন্দর কুনয়ারের কক্ষ ত্যাগ করলেন।

প্রথমত তিনি চলে এলেন নিজের গোপন কক্ষে।

দরবারে যাবার পূর্বে তার আলোচনা করে দেখবার প্রয়োজন আছে।

সঈদ ভাই তাকে সিংহাসন দিলেও তাদের উদ্দেশ্য আজ বাদশার কাছে ধরা পড়েছে।

তারা প্রকৃতপক্ষে ফর্‌রুকসিয়রকে সম্মুখে রেখে হিন্দুস্থানের ভাগ্য-বিধাতা হতে চান।

কিন্তু মোগল বাদশার স্বাধীন রক্ত রয়েছে ফর্‌রুকসিয়রের মধ্যে, তাই তিনি কারো পরিচালনা মেনে নিতে রাজি নন।

মেনে নিতে রাজি না থাকলেও প্রকাশ্যে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও ভরসা পাচ্ছেন না তিনি।

তাই প্রস্তুতি-পর্ব চলেছে, ঔরংজীবেরই দুজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর সঙ্গে-মিরজুমলা আর এনায়েৎ খাঁ।

মিরজুমলা আর এনায়েৎ বাদশার নির্দেশে পূর্বেই উপস্থিত ছিলেন।

বাদশাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নীস জানালেন তাঁরা।

বাদশা তাঁদের বসতে আজ্ঞা দিলেন।

তারপর মন্ত্রণা চলল।

কথা বললেন ফর্‌রুকসিয়রই প্রথম, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কেন আপনাদের ডাকা হয়েছে?

এনায়েৎ খাঁ বললেন, জানি খোদাবন্দ। এবং এ বান্দাদের দিয়ে যদি আপনার কোনপ্রকার উপকার হয় তবে জান দিতে কুণ্ঠিত হব না আমরা।

বাদশা বললেন, আজকে দরবারে অজিত সিংকে নতুন মনসব দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে আরো নতুন প্রস্তাব হয়তো আনবেন সঈদ ভাইয়েরা। সে প্রস্তাব সম্ভবত নতুন করে সুবা বন্টন নিয়েই হবে। ওরা চাইবেন তাদের লোক নিয়োগ করতে। কিন্তু সঈদ ভাইয়েরা যথেষ্ট দূর এগিয়েছেন। তাদের প্রকৃত রূপ আমার কাছে এতদিনে ধরা পড়ে গেছে। এবার ওদের রাশ টেনে ধরবার সময় এসেছে। আপনারা আমাকে বুদ্ধি দিন।

মিরজুমলা বললেন,—খোদাবন্দ প্রশ্ন বড় জটিল। গোপনে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন সঈদ ভাইয়েরা। এখন হঠাৎ তাদের থামাতে চেষ্টা করা বিপজ্জনক হবে। সুতরাং আমাদেরও সে ভাবেই চলতে হবে।

চিন্তান্বিতভাবে বাদশা বললেন, বলুন আমাদের কি করতে হবে?

মিরজুমলা বললেন,—সমস্ত দেশের অবস্থা এখন ভয়ানক খারাপ। হিন্দুস্থানের মধ্যে এখন তিনটি প্রবল শক্তি রয়েছে—মুসলমান, রাজপুত আর মারাঠা। এরা কেউ কাউকে সু-দৃষ্টিতে দেখছে না। এর উপর মুসলমানদের মধ্যেও দরবারে দুটি দল রয়েছে, তুরাণী আর ইরাণী। সঈদ ভাইদের হাতে রয়েছে তুরাণী দল! তাদের বিরুদ্ধে যদি এখন আমাদের দাঁড়াতে হয় তবে তুরাণী দলকে আপনার হাত করতে হবে। এবং হিন্দুদের মধ্যেও রাজপুত এবং মারাঠা এদের মধ্যে এক দলকে স্বপক্ষে টানতে হবে।

বাদশা বললেন, কাফেরদের আমার পছন্দ নয়।

এনায়েৎ খাঁ বললেন, আমারও তাই মত।

মিরজুমলা উভয়কে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, বললেন, এটা আবেগের কথা নয় খোদাবন্দ। এটা বিবেচনার কথা। প্রয়োজনে সব কিছুই করতে হয়। আজকে শুধু ইরাণী দল নিয়ে তুরাণীদের বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়। ওরা তবে রাজপুতদের নিয়ে অনেক শক্তিশালী হবে। আমরা পারব না।

বাদশা বললেন, তাহলে কাফেরদের সবাইকে দলে টানতে বলছেন আপনি ?

মিরজুমলা বললেন, সবাইকে নয়, এবং সবাইকে দলে টানা সম্ভব বলেও মনে হয় না আমার। কারণ রাজপুতরা যে দলে থাকবেন মারাঠারা সে দলে থাকবেন বলে মনে হয় না আমার।

—কেন ?

—কারণ ওরা পরস্পরের শত্রু !

বাদশা বললেন, তাহলে কাফেরদের মধ্যে কার দিকে ঝুঁকে পড়া পছন্দ মনে করেন আপনি ?

মিরজুমলাকে উত্তর দিতে না দিয়ে এনায়েৎ বললেন, তাহলে রাজপুতদের দিকে ভিড়তে হয়। মারবারের সঙ্গে বাদশার সাদী সে পথ প্রশস্ত করেছে।

মিরজুমলা বললেন, সেটা বোধ হয় সম্ভব নয়।

—কেন ?

আপনি বোধহয় অজিত সিংহের চরিত্র জানেন না। তাকে বিশ্বাস করা যায় না। তা ছাড়া অন্যান্য রাজপুতেরা আমাদের বিরুদ্ধে রয়েছেন। সঈদ ভাইয়েরা তাদের অনেককেই দলে ভিড়িয়েছেন।

বাদশা প্রশ্ন করলেন, তাহলে ?

মিরজুমলা বললেন, আমার মতে মারাঠাদের বাজিয়ে দেখাই কর্তব্য। তাদের আমাদের দিকে যোগ দেবার একটা কারণ আছে। তারা তুরাণীদের বিরুদ্ধে। দাক্ষিণাত্যে নিজামের বিরুদ্ধে ভয়ানক অসন্তুষ্ট। নিজাম তুরাণী দলে। সুতরাং মারাঠাদের সাহায্য চাইলে সম্ভবত পাব। দ্বিতীয়ত এখন মারাঠারা রাজপুতদের চেয়ে শক্তিশালী। রাজপুতরা আত্মকলহে দুর্বল।

বাদশা বললেন, তাহলে মারাঠাদেরই আপনার পছন্দ ?

মিরজুমলা উত্তর দিলেন, স্পষ্ট করে কিছু বলতে পাচ্ছি না। সমস্ত বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। এখন রাজপুত মারাঠা উভয়কেই

বাজিয়ে দেখতে হবে। এর মধ্যে আমাদের নিজেদেরও প্রস্তুত হতে হবে।

—কি রকম ?

মিরজুমলা বললেন, অর্থই এখন শক্তি। সেই অর্থ যাতে আমাদের হাতে আসে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

—বলুন ?

—আপনি বাদশাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজের দলভুক্ত লোককে দেওয়ানী দিন। কারণ যে সংগ্রাম আমরা করতে যাচ্ছি তাতে অর্থের প্রয়োজন হবে সব চেয়ে বেশী।

বাদশা প্রশ্ন করলেন, কাকে সে দায়িত্ব দেওয়া যায় বলে আপনার মনে হয় ?

মিরজুমলা উত্তর দিলেন, এনায়েৎ খাঁকেই আমি যোগ্য লোক বলে মনে করি। আলমগীরের অধীনে অর্থদপ্তরে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আপনি ওঁকেই দেওয়ান নিযুক্ত করুন।

বাদশা তাকালেন এনায়েৎ খাঁর দিকে।

এনায়েৎ খাঁ অতি বিনীত ভাবে বললেন, এ বান্দাকে আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।

বাদশা বললেন, তবে আপনি দেওয়ানী গ্রহণ করুন।

এনায়েৎ খাঁ বুঝি এবার মিরজুমলার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখালেন, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমারও একটি আর্জি আছে খোদাবন্দ ?

—বলুন।

—আপনি মিরজুমলাকে আপনার মন্ত্রীমণ্ডলির একজন করে নিন। তাহলে কুতুব উল্‌মুল্‌কে সামলান সম্ভব হবে আপনার।

বাদশা একটু হেসে তাকালেন মিরজুমলার দিকে।

কুর্নীস জানিয়ে মিরজুমলা বললেন, জাহাপনাব যা অভিরুচি।

বাদশা মিরজুমলাকে মন্ত্রীপদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মিরজুমলা বললেন, বাদশা যখন আমাকে পরামর্শদাতা বলে

গ্রহণ করেছেন তখন সৎ পরামর্শ দেবার দায়িত্ব আমার। সুতরাং আপনার অভিষ্টলাভের জন্য আমি চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করব না। আমি বুঝতে পেরেছি—জাহাপনা মোগল সাম্রাজ্যের যোগ্য শাসক হতে চান। সঈদ ভাইদের ক্রীড়ানক হওয়া আপনার পছন্দ নয়! বলাই বাহুল্য আপনার এ প্রচেষ্টা সঈদ ভাইদেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। সুতরাং প্রাধান্য নিয়ে বিবাদ অবশ্যম্ভাবি। বর্তমান দরবারেই সে প্রাধান্য নিয়ে তর্ক উঠবে। বাদশাকে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে।

—কি রকম? প্রশ্ন করলেন ফর্‌রুকসিয়র।

মিরজুমলা বললেন,—যে কোন প্রস্তাবই সঈদ ভাইয়েরা অনুননা কেন সহজে বিশ্বাস করবেন না। বিবেচনা করে দেখবেন তাতে প্রকৃতই আপনার ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে কিনা।

ফর্‌রুকসিয়র বললেন, আপনি কি আঁচ করতে পেরেছেন, সঈদ ভাইয়েরা কোন্ পথে আক্রমণ করতে পারেন?

—সবটা সম্ভব নয়। তবে কিছু কিছু যে না বুঝতে পাচ্ছি তাও নয়।

—যেমন?

মিরজুমলা বললেন,—আজকের দরবারে সঈদ ভাইয়েরা প্রথমেই সম্ভবত মুর্শিদকুলি খাঁকে আক্রমণ করে কথা বলবেন। পূর্ব বিদ্বেষ স্মরণ করে বাদশা যেন তৎক্ষণাৎই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না।

—কেন?

—কারণ বাঙলার কর্তৃত্ব বাদশার অধীনে আনবার নাম করে প্রকৃতপক্ষে ওরা নিজেদের লোক ওখানে বসাতে চাইবেন।

বাদশা বললেন, বেশ,—না হয় ওদের কথায় বিশ্বাস করে বাঙলার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করব না। কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁ আমার ফরমান অস্বীকার করেছেন, সে বেয়াদপির কি হবে?

মিরজুমলা উত্তর দিলেন, সমস্ত কিছুই ধীরে ধীরে করতে হবে জনাব।

মুর্শিদকুলি খাঁ যে অন্যায় করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই অন্যায়ের কথা মনে করে এই মুহূর্তে বাঙলার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া উচিৎ হবে না। ফলে শত্রু বৃদ্ধি হবে। হয়তো মুর্শিদকুলিই সঈদদের হাতে গিয়ে পড়বেন। তার চেয়ে প্রথমত মুর্শিদকুলিকে দলে টানবার চেষ্টা করতে হবে।

বাদশা একটা গম্ভীর ভাব বজায় রেখে নীরব থাকলেন। তার হাবভাব দেখে মনে হ'ল যে এ প্রস্তাব তার মন মত হয়নি। মুর্শিদকুলি খাঁকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছেন না।

বাদশার মনের অবস্থাটা বুঝে নিয়েই মিরজুমলা বললেন, রাজনীতি বড় জটিল জাহাপনা। এখানে শত্রু মিত্রের যাচাই হবে— উদ্দেশ্য সাধনের কার্যকারিতা দিয়ে শত্রু দ্বারা কাজ হলে তাকেও মিত্র রূপে গ্রহণ করতে হবে। যতক্ষণ না দিল্লীতে আপনার কর্তৃত্ব পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ কোন প্রদেশের সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নয়।

সুতরাং যে কোন রকম প্রস্তাব যদি দরবারে সঈদ ভাইয়েরা আনেন, আপনি অস্বীকার করবেন।

কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েই যেন বাদশা বললেন, বেশ, আপনারা যা ভাল বোঝেন তাই হবে।

গোপন কক্ষ শেষ হল।

উপযুক্ত পরামর্শ নিয়ে বাদশা দরবারে এলেন।

সঈদ ভাইয়েরা আগেই দলবল নিয়ে দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

মনসবদার হিসেবে নতুন সম্মান পাবেন অজিত সিংহ।

তিনিও দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

অনেক দিন পরে পূর্ণভাবে দেওয়ানী আমে আবার দরবার আরম্ভ হ'ল।

বাদশা তার পরিচালকবৃন্দ পরিবৃত হয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন।

অবশ্য তার অতি প্রিয় পাত্র এনায়েৎ খাঁ আর মিরজুমলা পৃথক ভাবেই দরবারে প্রবেশ করেছিলেন।

বাদশার সঙ্গে একত্রে এলে পাছে সন্দেহের উদ্রেক হয় সেইজন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘোষকের তারস্বরে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাদশা দরবারে প্রবেশ করলেন। সমস্ত দরবার কক্ষ রীতি অনুযায়ী আভূমি নত হয়ে মহামান্য সম্রাটকে কুর্নীস জানাতে থাকল।

নতুন আগত মহারাজ অজিত সিংহ থেকে কেউ বাদ গেলেন না।

বাদশা আসন গ্রহণ করলেন।

বাদশার অনুমতি নিয়ে ওমরাহেরাও যে যার স্থান গ্রহণ করলেন।

উলেমার খুত্‌বা পাঠের শেষে দরবার আরম্ভ হ'ল।

বাদশা কুতুব-উলমুল্‌ক আবদুল্লা খানকে সূচী অনুযায়ী দরবার আরম্ভ করবার অনুমতি দিলেন।

প্রথম ছিল মহারাজা অজিত সিংহকে মনসবদারী।

আজ থেকে দরবারে তিনি একজন গণ্যমান্য আমীর বলে বিবেচিত হবেন।

তাঁর মর্যাদা হবে পাঁচ হাজারী মনসবদারী।

নতুন মন্‌সবদার হিসেবে মহারাজা বাদশাকে নজরানা দিলেন— কিছু আসরফি আর মূল্যবান পাথর।

বাদশা অনুমোদনের ভঙ্গিতে সেগুলো গ্রহণ করলেন।

কার্যসূচী হিসেবে এবারে প্রয়োজনীয় কথা পাড়লেন কুতুব উল্‌মুল্‌ক।

বাদশাকে কুর্নীস জানিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, মহামান্য বাদশা অনুমতি দিলে কিছু বলতে চাই।

অনুমতি দিলেন বাদশা।

কুতুব উলমুল্‌ক আবদুল্লা খাঁ বলতে লাগলেন,—'জাহাপনাকে হিন্দুস্থানের অধিকাংশ সুবাই 'বাদশা' বলে ভেট পাঠিয়েছেন,—কিন্তু আজ পর্যন্ত বাঙলায় সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁ কোন রকম নজরানা পাঠান নি।'

কথাটা বলতেই বাদশা যেন কেমন একটু চমকে উঠলেন।

হঠাৎ গোপন মন্ত্রণা কক্ষের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

স্বতঃই একবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এনায়েৎ খাঁ আর মিরজুমলার উপর।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি আবার নিজের মধ্যে ফিরে এলেন।

খুব সাবধানে চলতে হবে।

তিনি আবার চোখ ফেরালেন কুতুব উলমুলকের দিকে।

কুতুব উল্‌মুল্‌ক বলে চললেন,—শুধু যে তিনি নজরানা পাঠাননি তা' নয়, মহামান্য বাদশা বাঙলা দেশে ইংরেজদের যে ফারমান দিয়েছেন, সে ফারমানকেও বাঙলার সুবেদার অস্বীকার করেছেন। :

এইটুকু বলে কুতুব উলমুলক একবার বাদশার দিকে চোখ ফেরালেন—তার বক্তৃতায় বাদশার উপর কি রকম প্রতিক্রিয়া হ'চ্ছে দেখবার জন্যে।

কিন্তু বাদশার মুখ দেখে কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। আশানুরূপ প্রতিক্রিয়ার কোন লক্ষণ ফুটে উঠেনি বাদশার মুখে।

কি যেন, কি মনে করে, তিনি ভাইসাব আমীর-উল-ওমরা হুসেন খানের দিকে তাকালেন।

দু'ভাইয়ে কেমন একটু দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। তারপর কুতুব উলমুলক আবার বলতে লাগলেন, মুর্শিদকুলির এ ব্যবহারকে বিদ্রোহ বলেই ধরে নেওয়া যায়। সুতরাং আমাদের নিতান্ত দরকারি কাজ হচ্ছে এই মুহূর্তে বাঙলার দিকে দৃষ্টি ফেরান।

এই সময় এনায়েৎ খাঁ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান?

একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে এনায়েৎ খাঁকে দেখে নিয়ে বললেন আবদুল্লা,—বাঙলার বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাতে হবে।

—কিন্তু সেইটেই কি এখন প্রথম প্রয়োজন ?

—আমার তো মনে হয় তাই।

এনায়েৎ খাঁ বললেন, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি যা বলে তাতে এই মুহূর্তে একটা যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ না করে অন্য উপায় অবলম্বন উচিত।

—কি রকম ?

—মুর্শিদকুলি খাঁকে সময় দিতে হবে।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে আগে যে দিল্লীর মসনদে নতুন বাদশা বসেছেন।

আবদুল্লা বললেন, আমার তো মনে হয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে কোন লাভ নেই। মুর্শিদকুলি খাঁ আমাদের শত্রুতা করতে বদ্ধপরিকর। এখন বাদশার মর্জির উপর সব নির্ভর করছে।

বাদশা একটু ইতস্তত করে বললেন, আমার মনে হয়, এনায়েৎ খাঁর পরামর্শটা মন্দ নয়।

সঈদ ভাইদের দুজনেই তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাদশার মুখটা দেখে নিলেন।

কি দেখলেন তাঁরাই জানেন। পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। আবদুল্লা বললেন, বাদশার যা মর্জি তাই হবে। তবে ফল বিপরীত হলে আমাদের দুষবেন না।

আবদুল্লার কথার মধ্যে যেন কিসের একটু ঔদ্ধত্য। বাদশা ক্ষুন্ন হলেন। কিন্তু তখুনি তা প্রকাশ করলেন না। বললেন, বাঙলার কথা বিবেচনা করা হবে, এবার অন্য কি আর্জি বলুন।

আবদুল্লা বললেন, আমার মতে এটাই প্রথম কাজ। আমার অন্য কিছু বলবার নেই।

এই সময় মিরজুম্‌লা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, আমার একটা আর্জি আছে খোদাবন্দ।

—বলুন।

—আমার মনে হয় বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল অর্থ নৈতিক সমস্যা।

সম্রাজ্যকে শক্তিশালী করতে হলে অর্থের প্রয়োজন প্রথম!

বাদশা বললেন, বেশ, বলুন কি করতে হবে আমাদের?

মির্জুমলা বললেন,—আর্থিক শৃঙ্খলা আনতে হলে অর্থ দপ্তর গুছোতে হবে আগে। যোগ্য লোকের উপর দেওয়ানীর ভার দিন এটাই চাই আমরা।

ঠিক কথা।

অর্থনীতিতে অনভিজ্ঞ সঈদ ভাইদের উপরই ছিল দেওয়ানীর ভার ওরা অবশ্য সময় বুঝে নিজেদের লোকের হাতেই সেটা দেবার কথা চিন্তা করেছিলেন।

হঠাৎ অর্থদপ্তরের কথা এভাবে উত্থাপিত হওয়াতে একটু যেন চমকে উঠলেন সঈদ ভাইয়েরা।

একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ যেন স্পষ্টই পেলেন।

বাদশাও তাদের মুখে সেই মুহূর্তে একটা পরিবর্তনের ভাব ফুটে উঠতে দেখতে পেলেন।

বিজ্ঞের মত চাল চাললেন তিনি।

সঈদ ভাইদেরই এ প্রশ্নের যৌক্তিকতা জিজ্ঞেস করলেন তিনি। বললেন, কুতুব উল্‌মুলক এ বিষয়ে কি ভাবেন?

একটু যেন বিবর্ণ হ'ল কুতুব উল্‌মুলকের মুখ। বললেন, হ্যাঁ, তা এ প্রশ্ন অস্বীকার করবার উপায় নেই।

—কিছু ভেবেছেন এ বিষয়ে?

আবদুল্লা বললেন যোগ্য লোক এখনো নজরে পড়ছে না। সময় হলে নিশ্চই…

একটু যেন প্রতিবাদের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন মিরজুমলা। বললেন, যোগ্য লোকের অভাব নেই। চোখ থাকলেই কুতুব উলমুলক দেখতে পেতেন।

—একটু টিপ্পনি কেটে বললেন আবদুল্লা, জনাব কি নিজেকেই সেই লোক বলে মনে করেন ?

মিরজুমলা বললেন, না। নিজের অযোগ্যতা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। কিন্তু একজন এ দরবারে উপস্থিত আছেন যাঁর অর্থ দপ্তরে বিরাট অভিজ্ঞতা রয়েছে।

একটা প্রশ্নের ভঙ্গিতে আবদুল্লা তাকালেন মিরজুমলার দিকে।

মিরজুমলা বললেন, জনাব এনায়েৎ খাঁই সেই লোক। বাদশা আলমগীরের অধীনে দীর্ঘ দিন তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। স্বয়ং আলমগীরও তাকে বিশ্বাস করতেন।

সকলেরই দৃষ্টি এবার গিয়ে পড়ল সেই পক্ক কেশ বৃদ্ধের দিকে।

কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত বোধ করলেন এনায়েৎ খাঁ।

এবার বাদশা কথা বললেন, জনাব, মিরজুমলার কথা অযৌক্তিক নয়। অর্থ দপ্তরে একজন অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। এখন সাহেব যদি···

বিনম্র ভাবে উঠে দাঁড়ালেন এনায়েৎ খাঁ। বললেন,—জাহাপনার মর্জির বিরুদ্ধে কারো হাত নেই। বাদশা যদি আদেশ করেন তবে সে কাজ করতে হবে বৈকি। উত্তম সুযোগ। বাদশা সেই মুহূর্তে প্রস্তাব করলেন তাকে দেওয়ান করবার জন্য। বললেন, বেশ তবে দেওয়ানী দপ্তরের ভার থাকল আপনার উপর।

সমস্ত দরবার সৌজন্যের খাতিরেও বাশার সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

শুধু একটু বিবর্ণ ভাব ফুটে উঠল সঈদ ভাইদের মুখে। দরবার ভাঙল তারপর।

বাদশা তার অনুচর পরিবৃত হয়ে দরবার ত্যাগ করলেন।

আমিরেরাও যে যার গন্তব্য স্থানের দিকে চললেন। শুধু অশ্ব পৃষ্ঠে পাশাপাশি কথা বলতে বলতে চললেন সঈদ ভাই আবদুল্লা আর হুসেন আলি।

ছোট ভাই হুসেন আলি বললেন, বুঝলে?—

আবদুল্লা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, বুঝেছি।

একটা অবজ্ঞার ভাব মুখে ফুটিয়ে হুসেন বললেন, ডানা গজিয়েছে। আর দেরী নেই।

আবদুল্লা উত্তর দিলেন, দেখা যাক কতদূর যায়।

চলতে লাগলেন ওরা।

তের

দরবার শেষে নিতান্ত ক্লান্ত ভাবে বাদশা এলেন বেগম মহলে।

ফারুকউন্নিসার কাছেই এলেন।

দরবারের ঐটুকু সময়ের মধ্যে যে মানসিক ঝড় বয়ে গিয়েছে তাঁর উপর দিয়ে তা যেন নির্মম।

এক মুহূর্তে তা বাদশাকে যেন প্রমান করে দিয়েছে।

তার নির্মম চাপে কয়েক ঘণ্টাতেই বাদশা যেন নত হয়ে গেছেন।

তার সেই শ্রান্তির ভাব হারেমে প্রবেশ করতেই বেগমের নজরে পড়ল! একটু যেন ভয় পেয়ে গেলেন ফারুকউন্নিসা।

কোন একটা অমঙ্গল আশঙ্কা করল সে। ব্যস্ত ভাবেই যেন বলল সে, কি হয়েছে খোদাবন্দ?

ক্লান্ত হাসি হেসে বললেন ফররুকসিয়র, কি?

—আপনাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে?

ফর্‌রুকসিয়র বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমি ক্লান্ত, ভয়নক ক্লান্ত।

—কেন, কি হয়েছে খোদাবন্দ ?

—কিছুকাল ফারুকউন্নিসার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন বাদশা, তোমার কথাই ঠিক। তক্তে তাউসের নিচে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত আর হিংসা : শান্তি নেই ওখানে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ফারুক।

ফারুক স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব থাকল।

ফর্‌রুকসিয়র বললেন, এবার আমি বিশ্রাম চাই ফারুক। দীর্ঘদিন বিশ্রাম চাই তোমার কাছে। ভুলে থাকতে চাই জঘন্য রাজকার্য্য : হারেমকে উপভোগ করতে চাই আমি। তুমি আমায় বিশ্রাম দাও।

এবার কথা বলল ফারুক, তা আর সম্ভব নয় জনাব।

একথা যেন আশা করতে পারেন নি ফর্‌রুকসিয়র। এক মুহূর্ত তিনি বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন. ভুল করেছি বলে তুমিও শাস্তি দেবে ?

ফারুক বলল, না খোদাবন্দ, সে জন্য নয়। আপনার এখন স্বাভাবিক কারনেই ফিরে আসা চলে না।

—কেন ?

—দেখুন, প্রথমত মানুষ ক্ষমতা লোভে রাজকার্য্য গ্রহণ করে। কিন্তু ক্ষমতায় আসলেই দেখা যায় ক্ষমতা পাওয়ার চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। প্রাধান্য বিস্তার করতে হলে কতকগুলো দায়িত্ব পালন করতে হয়। সে দায়িত্ব পালনে সুখ শান্তি বিসর্জন না দিলে হয় না। সুতরাং দায়িত্ব যখন গ্রহণ করেছেন ক্লান্ত হলেও বিশ্রাম নেওয়া চলবে না।

—কেন ? এমন কোন দাস খৎ তো দিইনি।

ফারুক বলল, রাজকার্যটা অধিকার নয়, দায়িত্ব গ্রহণ। অপরের ভাল করবার, রাষ্ট্রের মঙ্গল দেখবার দাস খৎ দিয়েই এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। দায়িত্ব গ্রহণ করে তা পালন না করা অন্যায়। সেটা শুধু রাষ্ট্রের নয়, শাসকেরও সর্বনাশ ডেকে আনে। যুগে যুগে

এরকম ঘটেছে। বর্তমানেও এর ব্যতিক্রম নেই। জাহান্দার শা দায়িত্ব গ্রহণ করে তা পালন না করে নিজের জীবন দিয়ে কি দেখিয়ে যান নি ?—

—জাহান্দার শা দুর্বল ছিলেন !

—দায়িত্ব পালন না করলে দুর্বলতা যে আপনিই আসে জাহাপনা। তবু পরিশ্রান্ত স্বর ফুটে উঠল ফররুকসিয়রের মধ্যে, বললেন, আমি বড় ক্লান্ত ফারুক।

—কিন্তু ক্লান্তির কাছে নতি স্বীকার করলে চলবে না খোদাবন্দ।

বাদশা বললেন, না আর পারছি না, তুমি আমাকে সিরাজি দাও।

ফারুকউন্নিসা এগিয়ে এসে হাত ধরল বাদশার। বলল, আমার অনুরোধ, এই মুহূর্তে সিরাজি পান করবেন না খোদাবন্দ।

বাদশা বললেন, কিন্তু আমি কিছুক্ষনের জন্য ভুলে থাকতে চাই।

দৃঢ়কণ্ঠে ফারুকউন্নিসা বলল, না।

একটু কি বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল বাদশার মুখে ?

তিনি যেন কেমন এক ভঙ্গিতে তাকালেন ফারুকের দিকে।

ফারুক সে দৃষ্টিকে ততটা গ্রাহ্য না করেই বলল, কি হয়েছে এবার বলুন জাহাপনা।—

এবার একটু কঠিন কণ্ঠেই যেন বললেন বাদশা, না, অন্দর মহল বিলাসের স্থান, রাজকার্যের নয়।

ফারুক বলল, কিন্তু স্ত্রী, অর্ধাঙ্গিনী, দায়িত্বের ভাগ তারও। একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল ফারুকসিয়রের মুখে। বললেন, স্ত্রী অর্ধাঙ্গিনী খৃষ্টানদের। হিন্দু বা মুসলমানের নয়। কারণ তারা বহু দার গ্রহণ করে।

কথাটা বলেই বাদশা বেরবার জন্য পা বাড়ালেন !

ছুটে গিয়ে বাধা দিল ফারুক, যাবেন না বাদশা।

বাদশা বললে, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন।

ফারুক এবার প্রশ্ন করল, কিন্তু পাটনা প্রাসাদে আপনি আমাকে কি কথা দিয়েছিলেন ?

—বল।

—আমাকে অস্বীকার করবেন না!

—অস্বীকার তোমাকে আমি করিনি, তুমি আজ আমাকে করলে। বলে বাদশা বাইরে চলে গেলেন।

সেই দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ফারুক। তার দু'চোখে গভীর বিষাদ ফুটে উঠল।

স্পষ্ট যেন দেখতে পেল ফারুক,—মোগল সাম্রাজ্যের উপর ঘাতকের হাত বাড়িয়েছে।

নিস্তার নেই কা'রো।

নীলরক্তের বিষে জর্জর বাদশা নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনবেন।

ফর্‌রুকসিয়রের মধ্যেও ফুটে উঠেছে সেই নীলরক্তের আশঙ্কা।

অপরদিকে দরবার শেষে আমির-উল-ওমরার প্রাসাদের সঈদ ভাইয়ের মিলিত হলেন।

উভয়েই তারা উত্তেজিত।

একটু বেশী উত্তেজিত দেখাচ্ছিল হুসেন আলী খাঁকে।

হুসেনই কথা বললেন প্রথম, বাদশার ঔদ্ধত্যের সমুচিৎ জবাব দিতে হবে।

আবহুল্লা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ঐ সঙ্গে এনায়েৎ আর আর মির-জুমলাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে—এ বাদশা সেই মোগল বাদশা নন। এ আমাদের হাতের পুতুল। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানের শাসক এখন সঈদ ভাইয়েরা।

হুসেন আলি বললেন; আমার ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে দুষমনটাকে গদি থেকে হটিয়ে দিই।

আবদুল্লা বললেন,—ধীরে। অত উত্তেজিত হলে চলবেনা। বাদশার নিজের শক্তি না থাক, নামের একটা শক্তি আছে। হঠাৎ কিছু করতে গেলে আমাদেরও বিপদ হতে পারে। এবার আমাদেরও অনেকগুলো কাজ জমল।

—কি রকম ?

—সব কিছুর উপরই কড়া নজর রাখতে হবে। ঘটনার গতি বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইতিমধ্যে আমাদের দলে আমীরদের টানতে হবে; প্রথম মোরাদাবাদের নিজাম উলমুল্‌কে বাজিয়ে দেখতে হবে। লোকটা দিনে দিনে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে। দশ হাজার মারাঠা সৈন্যও আছে ওর অধীনে।

হুসেন আলি বললেন, নিজাম কি আমাদের দলে ভিড়বেন ?

আবদুল্লা বললেন, লোভ দেখালেই ভিড়বেন। মালবে নতুন সুবেদার নিযুক্ত করতে হবে। নিজামকে লোভ দেখালে তিনি আমাদের দলে ভিড়তেও পারেন।

—সে ব্যবস্থা তবে শিগ্‌গীরই করতে হবে।

—হ্যাঁ, আমি নিজামের কাছে দূত পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—তারপর ?

—রাজপুতদেরও হাত করবার চেষ্টা করতে হবে। প্রথম মহারাজ অজিত সিংকে বাজিয়ে দেখতে হবে।

হুসেন আলি বললেন, নিজের জামাতার পক্ষ ছেড়ে তিনি কি আর আমাদের দলে ভিড়বেন ?

একটু হাসলেন আবদুল্লা, বললেন, মহারাজ অজিত সিংকে তুমি জাননা। অরাজপুত বলতে শুধু ঐ একটিই আছে। স্বার্থের খাতিরে তিনি নিজের পুত্রের বুকেও ছুড়ি বসাতে পারেন। জামাতা তো দূর সম্পর্ক।

আমি মহারাজ অজিত সিংকে ততটা ভয় করিনে, যতটা ভয় করি অন্যান্য রাজপুতদের।

হুসেন আলি বললেন, কেন ? ভয় কিসের ? অন্যান্য রাজপুতদের মধ্যেও তো অম্বর আর মেবার এখন বাদশার বিরুদ্ধে।

আবদুল্লা বললেন, বাদশার বিরুদ্ধে নয়, সমস্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে। তাঁরা হয়তো কোন পক্ষই গ্রহণ করবেন না, যদি করেন তবে এটা নিশ্চিত যে বাদশার পক্ষই গ্রহণ করবেন। তা ছাড়া···

—তাছাড়া ?—

—তা ছাড়া বুন্দি প্রমুখ রাজপুত্রেরা বাদশার পক্ষে। তবে আশার কথাও একটা আছে বটে।

সে কথা শুনে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে হুসেন আলি ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

আবদুল্লা বললেন, বাদশা নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছেন।

—কেমন ?

—এনায়েৎ খাঁকে দেওয়ান নির্বাচন করে। এনায়েৎ খাঁ হিন্দু বিরোধী। হিন্দুরা এতে সন্তুষ্ট হবেন না। তুমি দেখে নিও অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যে হিন্দুরা বাদশার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবেন। সেই পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

একটা সপ্রশংস দৃষ্টিতে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন হুসেন আলী। আবদুল্লা বললেন, আমি নিজামের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। তুমি মহারাজ অজিত সিংহকে হাত করবার চেষ্টা কর।

আর কোন কথা বললেন না আবদুল্লা। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন আজ এখানেই থাক। পরে আলোচনা হবে। তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন। যাবার আগে শেষবার মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন হ্যাঁ, তুমি খুব উত্তেজিত হয়ো না। ধীরে সুস্থে সব করতে হবে।

আবদুল্লা চলে গেলেন।

হুসেনও বিশ্রামের জন্য হারেমের দিকে চললেন।

অপর দিকে বাদশা সেই সময় ফারুকউন্নিসার কাছ থেকে ফিরে এসে নর্তকী মহলে এলেন। তিনি ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত। চক্রান্তের নিষ্পেষনে বিধ্বস্ত। যেন ফুরিয়ে গিয়েছেন তিনি। নিজেকে পূর্ণ করবার প্রয়োজন হয়েছে আজ।

পাটনা থেকে সেই যে দিল্লী এসেছেন এর মধ্যে এতটুকু বিশ্রাম নেই।

তাঁর যৌবন যে আজো বেঁচে আছে, একথা যেন ভুলেই গেছেন তিনি।

তার ইন্দ্রিয়গুলি তৃষ্ণার্ত, বড় তৃষ্ণার্ত।

উত্তেজনার প্রয়োজন হয়েছে আবার।

চাই সিরাজী, চাই নর্তকী।

নীলরক্তের মধ্যে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে—খাদ্য চাই।

তাই নর্তকী মহলে এসেছেন তিনি।

পিয়ারা বাঈজী।

যেমনি রূপ, তেমনি গুণ।

কোকিলের মত কণ্ঠ আর—পায়রার মত লঘু চরণ।

বাদশা পিয়ারার নিকুঞ্জে এলেন।

বাঈজী প্রথম একটু চমকেই উঠল যেন।

জাহান্দার শার পর নর্তকী মহল অবহেলিত। ফর্‌রুকসিয়র শিল্পের চেয়ে জীবনকে বড় করে দেখেছেন। সেই জীবন নিয়েই ব্যস্ত তিনি, শুধু কাজ আর কাজ।

সেই ফর্‌রুকসিয়র হঠাৎ বাঈজী মহলে আসবেন, এটা যেন কল্পনাও করতে পারেনি সে।

তাই একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলল সে, একি খোদাবন্দ, আপনি?

বাদশা বললেন, কেন মোগল বাদশারা কি কখনো নর্তকী মহলে আসেন নি।

কি বলবে পিয়ারা ! কিছুক্ষণ বাদশার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আসবেন না কেন। অনেকে এসেছিলেন। আবার ব্যতিক্রমও ছিল। আলমগীর ছিলেন সেই ব্যতিক্রম। জাহাপনাকেও আমরা সেই ব্যতিক্রম বলেই ধরে নিয়েছিলাম।

বাদশা বললেন, না আমি আলমগীরেব মত চিরবৃদ্ধ নই। আমার যৌবন আছে। আমি যৌবনকে উপভোগ করতে চাই। পিয়ারা দেবপুত্রের মত সুন্দর এই বাদশার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

বাদশা বললেন, আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে পিয়ারা।

পিয়ারা বলল, বাদী এখনি আপনার হুকুম তামিল করছে জনাব।

দূরে পরিচারিকা দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে তৎক্ষণাৎ সিরাজী আনতে ইঙ্গিত করল পিয়ারা।

মুহূর্তের মধ্যে পান পাত্র নিয়ে হাজির হল সে।

নিজের হাতে সিরাজী ঢেলে দিল পিয়ারা।

বাদশা কয়েকদিন পর পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে যেন পান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় ত্রাসের মধ্য দিয়ে এক তরিৎ প্রবাহ যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। সমস্ত বিশ্বপৃথিবী বাদশার চোখের সামনে।

বাদশা সেই চোখে তাকালেন পিয়ারার দিকে।

সুর্মা আঁকা চোখ দুটি বিস্তৃত আর দীর্ঘ। তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, আগুনের হল্কার মত যৌবন। উদ্ধত চাবুকের মত পিঠ জোড়া বেণী।

বাদশা যেন মন্ত্র মুগ্ধের মত পিয়ারার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তার মায়াবী চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পিয়ারাও মুগ্ধ করতে চাইল বাদশাকে।

বাদশা বললেন, পিয়ারা আমায় শান্তি দাও। বিশ্রাম দাও।

বাদশা কি চান ইঙ্গিতেই বুঝে নিল পিয়ারা।

নেপথ্যে প্রস্তুত নর্তকীদের করতলে আঘাত করে ডাকল সে। দেখতে দেখতে বহু নুপুরের নিক্কন ফুটে উঠল।

ঘাঘরাগুলো যেন হাওয়ায় কাশের মত আন্দোলিত হতে লাগল।

তবলার বোল ফুটল।

সেতার বাজল।

আর মুহূর্তের মধ্যে বহু সুন্দরী ঘিরে দাঁড়াল পিয়ারাকে।

সেই বেষ্টনীর মধ্য থেকে মেঘের ফাঁকে চাঁদের মত পিয়ারার যৌবন বাদশার চোখের কাছে উঁকি দিতে লাগল।

বসন্তের কোকিলকে পরাজিত করে পিয়ারার কণ্ঠ ফুটে উঠল।

বাদশা নিবিড় আবেগে পিয়ারার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

চৌদ্দ

আবদুল্লা খানের সন্দেহই শেষ পর্যন্ত সত্য হতে চলল।

এনায়েৎ খাঁ সঈদ ভাইদের হাতেই পড়লেন।

অর্থ দপ্তর গ্রহণ করেই চোখে যেন অন্ধকার দেখলেন এনায়েৎ খাঁ।

দপ্তর শুধু অর্থশূন্যই নয়, বিশৃঙ্খলও।

রাজা এজিয়ানের আস্তাবল যেন।

হারকিউলিস ছাড়া তাকে পরিষ্কার করা দুঃসাধ্য।

বৃদ্ধ বয়সে এনায়েৎ খাঁ সেই হারকিউলিসের ভূমিকাই গ্রহণ করতে গেলেন।

কিন্তু পারলেন না।

দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথম যে কথা এনায়েৎ খাঁর মনে হয়েছিল তা হল অর্থ সংগ্রহ।

অর্থ সংগ্রহ না হলে রাজকার্য অচল হতে বাধ্য।

প্রাপ্য অর্থ অনাদায়ে পড়ে রয়েছে।

প্রাপ্য অর্থ পাওয়া গেলেও ঋণ এতটা বেশী হয়েছে যে, তা মিটিয়ে হাতে কিছু থাকছে না।

সুতরাং, বেশী করে কর ধার্য করতে হচ্ছে।

কিন্তু বেশী করে কর ধার্য করা মানে শরিয়তের নীতির বাইরে যাওয়া।

গোড়া মুসলমান এনায়েৎ খাঁ, শরিয়তের বাইরে যেতে রাজি নন।

সুতরাং শরিয়তের নির্দেশের মধ্যে কিছু করা যায় কিনা তাই তিনি ভাবতে লাগলেন।

রাজস্ব আদায়ের কড়াক্কড়ির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপ্রচলিত একটি করও পুনরায় ধার্য করলেন, তার মধ্যে একটি জিজিয়া।

আর সঙ্গে সঙ্গে সঈদ ভাইদের হাতের খেলা খেললেন এনায়েৎ খাঁ।

জিজিয়া বিধর্মীর উপর নির্দ্ধারিত কর, ইস্‌লামের শাসনাধীনে বাঁচবার অনুমতির বিনিময়ে অর্থ প্রদান।

কিন্তু হিন্দুস্থানে বিধর্মীই বেশী। তাদের সহযোগীতা না পেলে শাসন অচল হবে এটা বুঝতে পেরেই বুদ্ধিমান মোগল সম্রাটরা জিজিয়ার উপর জোড় দেন নি।

ঔরংজীব ধর্মীয় গোড়ামীর জন্য জিজিয়া-কর ধার্য করে রাজপুত বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের এটাও একটি কারণ।

ঔরংজীবের পর আবার জিজিয়া উঠে গিয়েছিল।

[illegible] মোগল বাদশাদের পক্ষে সাধ্যও ছিলনা জিজিয়া কর পুনরায় ধার্য করা।

এনায়েৎ খাঁ সে কর ধার্য্য করলে সমস্ত দেশব্যাপী অসন্তুষ্টি দেখা দিল।

রাজপুত[illegible] একবাক্যে প্রতিবাদ করলেন।

জিজিয়ার প্রতিবাদে এবারেও মেবার এল এগিয়ে।

মেবারের রাণা তখন—উম্‌রা। তিনি চুপ করে বসে থাকলেন না।

অজিত সিং মৈত্রী অস্বীকার করে মোগল দরবারে চলে যাবার পর থেকে রাণা উম্‌রার স্বাধীনতা স্পৃহা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজপুত জাতটাই স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠছিল।

রাণা উম্‌রা, রাণা রাজসিংহের মত তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

তাঁর প্রতিবাদ পত্র দিল্লীর দপ্তরে পৌঁছল।

সঈদ ভাইয়েরা একথা জান্‌তে পারলেন। কিন্তু বাদশার পক্ষে একটি কথাও বললেন না তারা। বরং বাদশা যাতে বিপদে পড়েন, সেই ব্যবস্থাই করতে লাগলেন, গোপনে গোপনে রাজপুতদের উস্কানী দিতে লাগলেন। মহারাজা অজিত সিংহকে দলে টানলেন।

এই অসন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করে একটা সংঘাত অনিবার্য, এটা বিবেচনা করে মারাঠাদের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন করলেন।

নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের সঙ্গে তখন প্রায় একটা রফা হয়ে গিয়েছে।

তাঁকে তারা দিল্লী আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

এ ষড়যন্ত্রের কিছুটা আভাষ পেয়ে গেলেন এনায়েৎ খাঁ।

বাদশার গোপন কক্ষে মিরজুমলা, এনায়েৎ আর বাদশা মিললেন পরামর্শের জন্য।

সেই মুহূর্তে রাণা উম্‌রার প্রতিবাদ পত্র নিয়ে তাঁর দূত উপস্থিত হলেন দিল্লীতে।

বাদশা এনায়েৎ খাঁকে বললেন, একি করলেন দেওয়ান সাহেব?

এনায়েৎ একটু চিন্তিত ভাবে বললেন, এটা তো শরিয়তের বাইরে নয় খোদাবন্দ।

বাদশা বললেন, কিন্তু সময় বুঝে এটা না করাই উচিৎ ছিল।

এনায়েৎ উত্তর দিলেন, এটা প্রকৃত পক্ষে সঈদ ভাইয়েদের কাজ। না হলে এমন কোন ভারি কর চাপান হয়নি হিন্দুদের উপর

যার জন্যে এত প্রবল বিক্ষোভ হতে পারে। বাৎসরিক আয়ের এক তৃতীয়াংশের উপরও জিজিয়া ধরা হয় নি। তার উপর খোঁড়া, অন্ধ, গরীব, এদের বাদ দেওয়া হয়েছে। দু হাজার টাকা যদি আয় হয় তবে তের টাকা দিতে হবে জিজিয়া।...

বাদশা বললেন, ওরা অঙ্কের উপর নয়, নীতির উপর প্রতিবাদ করেছে।

—এ নীতি ইসলামের অননুমোদিত নয়। আমার মতে ভয় না পাওয়াই উচিৎ।

বাদশা বললেন—না আপনি এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করুন নচেৎ বিপদ হতে পারে। সঙ্গীদ ভাইদের জব্দ না করে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না।

মিরজুম্‌লার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, আপনার কি মত?

মিরজুম্‌লা বললেন, হ্যাঁ; এই মুহূর্তে জিজিয়া উঠিয়ে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এনায়েৎ বললেন, তাতে জাহাপনার অপমান হবে না?

এটাও একটা সমস্যা বটে।

ফরমাস জারি করে উঠিয়ে নেওয়ায় দিল্লী বাদশার দুর্বলতাই ধরা পড়বে। ফলে সাম্রাজ্যের পতন আরো দ্রুততর হবে।

একথার যৌক্তিকতাও ভেবে দেখলেন মিরজুম্‌লা আর বাদশা।

বাদশা একটু ভয় পেলেন।

—তাহলে উপায়?

ভাবতে লাগলেন ওরা।

হঠাৎ যেন মিরজুম্‌লা একটা পথ পেয়ে গেলেন, বললেন একটা উপায় অবশ্য করা যেতে পারে।

—বলুন?

—দু একজন প্রতিপত্তিশালী রাজপুতকে জিজিয়া থেকে মুক্তি

দিন। তাহলে জিজিয়া না উঠিয়েও আত্মপক্ষ প্রবল করা যেতে পারে।

তরুণ বাদশা যেন সেই মুহূর্তে কিছু ভাবতে পারছিলেন না।

বললেন, বলুন, কাকে মুক্তি দেওয়া যায় ?

মিরজুম্‌লা বললেন, মেবারের রাণার দূত এসময় দিল্লীতে রয়েছেন। তার সঙ্গে একটা আপোষ করুন।

এনায়েৎ খাঁ আর বাদশা ছু'জনেই প্রশ্নবোধক একটা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন মিরজুম্‌লার দিকে।

মিরজুমলা বললেন, মেবারকে জিজিয়া থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। মেবারের শক্তির চেয়ে সম্মান বড়। মেবার যদি নেতৃত্ব থেকে বিরত হয় তবে রাজপুতদের মধ্যে বিদ্রোহ ভাবটা কমে আসতে পারে। আর মেবারকে দরবারে স্থান দিন।

—তাহলে কি মেবার সন্তুষ্ট হবে ?

—একেবারে অসম্ভব নয়। মেবারের মর্য্যাদা এখন একটু কমে আসবার মতন হয়েছে। দিল্লী-বাদশার পদমর্যাদাকে এখন অনেকে সম্মানের মাপ কাঠি মনে করে। যদি সেই হিসেবে মেবারের রাণাকে সর্বোচ্চ মনসব দেওয়া হয়, তবে হয়তো তিনি আমাদের পক্ষে আসতেও পারেন। মেবার এলে অনেক রাজপুতদের সমর্থন আমরা পাব।

কথাটা নেহাৎ অযৌক্তিক নয়। বাদশা অনুমোদন করলেন।

মিরজুম্‌লা বললেন, তা যদি হয়, তবে মেবারের প্রতিবাদপত্র আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

প্রতিবাদপত্র সঙ্গে নিয়েই তিনি এসেছিলেন। প্রতিবাদ পত্রটি বাড়িয়ে ধরলেন তিনি।

বাদশা বললেন, ওতে প্রতিবাদের বিষয় কি কি ?

পাঠ করে শোনালেন মিরজুম্‌লা, প্রথমতঃ জিজিয়া উঠিয়ে নিতে হবে। হিন্দুদের উপর কোন রকমেই আর এটা স্থাপন করা চলবে

না। কোন চাঘতাই বাদশা মেবারে আর জিজিয়া কর স্থাপন করবেন না।

এনায়েৎ খাঁ বললেন, তাহলে তো জিজিয়া উঠিয়ে দিতেই বলছেন।

মিরজুম্‌লা বললেন, আমরা একে সীমাবদ্ধ করতে চাই শুধু মেবারের ক্ষেত্রে। আমার মনে হয় এতে রাণা অমত করবেন না।

প্রতিবাদ পত্রের নমুনা থেকেও যে কথা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে না।

দ্বিতীয় প্রতিবাদ পাঠ করলেন মিরজুম্‌লা, দাক্ষিণাত্যে মেবারের এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দেবার যে রীতি আছে তা থেকে মেবারকে মুক্তি দিতে হবে।

বাদশা বললেন, তারপর ?

—তৃতীয়তঃ, হিন্দুদের যে ধর্মমন্দির ধ্বংশ করা হয়েছে তা মেরামত করে দিতে হবে। অবাধ ধর্মাধিকার দিতে হবে।

চতুর্থতঃ—মেবারের অধীনে দেওলা, বাঁশোয়ারা, ডুঙ্গেপুর, সিরোহি প্রভৃতি যে সব ভূঁইয়া আর জমিদারেরা রয়েছেন, যাদের উপর রাণার কর্তৃত্ব রয়েছে, তাদের উপর দিল্লীর অধিকার আর থাকবে না।

—তাছাড়া—আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মিরজুম্‌লা।

বাদশা তার দিকে তাকালেন, বলুন।

—মেবারকে যদি আপনি প্রথম মনসব দেন তাহলে আরো কয়টি সর্ত আরোপ করবেন রাণা।

—রাণা কি মনসবের উন্নতি হলে সন্ধি করতে রাজি আছেন ?

মিরজুম্‌লা বললেন, রাণার দূতের সঙ্গে আলোচনা করে সেরকমই বুঝতে পেরেছি। রাণা সাতহাজারী মনসব দিলে সন্ধি করতে রাজি আছেন।

—সে ক্ষেত্রে তার সর্ত কি ?

মির জুমলা বললেন, সেক্ষেত্রে তার সর্ত হচ্ছে—রাণার কোন বাহিনীর প্রয়োজন শেষ হলে বাদশাহের হিসেব মিটিয়ে নেওয়া হবে।

সুকদার, জমিদার, মন্‌সবদারদের মধ্যে যারা সততা দেখাবে রাণা তাদের নাম জানাবেন, এবং যারা কর্ত্তব্যে অবহেলা করবেন বাদশা ও তাদের নামও রাণাকে জানাবেন, তাদের শাস্তি রাণা নিজে দেবেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় গৃহ ধ্বংস, সাম্য বিনষ্ট প্রভৃতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে রাণা দায়ী থাকবেন না।

বাদশা বিরাট এক ষড়যন্ত্রের সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলেন। কোন পথ দেখছিলেন না যেন তিনি। রাণার এ সর্ত অবমাননাকর হলেও এর মধ্যে যেন একটা আশার আলো দেখতে পেলেন তিনি। যেন কূল পেলেন। বললেন, আমি এ সর্ত গ্রহণ করতে রাজি আছি।

মিরজুমলা বললেন, তা হলে ব্যবস্থাটা দ্রুত করতে হবে, নইলে সঈদ ভাইয়েরা হয়তো রাণাকে দলে টানবার চেষ্টা করবেন।

বাদশা বললেন, বেশ যত শিগ্‌গীর সম্ভব আপনি সন্ধিপত্র তৈরী করুন।

মিরজুমলা বললেন,—এতেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না আমাদের।

বাদশার চোখে একটা ভয় ফুটে উঠল, বললেন, কেন? আর কি?

মিরজুমলা বললেন, আমি সংবাদ পেয়েছি যে সঈদ ভাইয়েরা দিল্লীতে নিজাম-উল্‌মুল্‌কে আসতে লিখে দিয়েছেন, মারাঠাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে যাচ্ছেন! যাতে ওরা এসব কিছু না করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

যেটুকু আশার আলো ফুটে উঠেছিল বাদশার চোখে মুখে, তা যেন মুহূর্তে নিভে গেল।

তার সমস্ত অবয়বে একটা স্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ।

ক্ষমতা লোভ করে সিংহাসনে এসেছিলেন তরুণ বাদশা।

সিংহাসনের মধ্যে দেখেছিলেন, প্রভূত্ব আর উপভোগ।

কিন্তু তার তলায় তলায় যে এত চক্রান্তের প্যাঁচ, সেটা মোটেই বুঝতে পারেননি তিনি।

সেই নারকীয় ষড়যন্ত্রে বাদশা আজ বিধ্বস্ত।

বাদশা প্রকৃতপক্ষে যে একটা সং মাত্র এ কথাই বার বার মনে হচ্ছিল তার।

সেই মুহূর্তে সিংহাসনের উপর সমস্ত লোভ দূরে চলে গিয়েছিল তাঁর।

মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

তরুণ বাদশার চোখে সেই ক্লান্তির আভাষ স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন মিরজুম্লা। বললেন, ভেঙে পড়বেন না খোদাবন্দ। রাজকার্যে এ দায়িত্ব অবশ্যম্ভাবি। এর চেয়ে অনেক বড় বিপদ এসেছে বাদশাদের উপর। সে সবও অতিক্রম করে গেছেন তাঁরা। আপনি যদি সাহস সঞ্চয় করে বিপদের মুখে দাঁড়াতে পারেন তবে দেখবেন—সব বিঘ্ন হাওয়ার মুখে ধুলোর মত উড়ে গেছে।

উত্তরে বাদশা একটু ক্লান্ত হাসি হাসলেন। বললেন, আপনারা আছেন, আপনারাই আমার ভরসা। যা ভাল হয় করবেন।

মিরজুম্লা আর এনায়েৎ খাঁ বিদায় নিলেন।

বাদশা উঠে দাঁড়ালেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি যেন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। নিজেকে নিতান্ত ক্লান্ত বোধ করলেন তিনি।

প্রাসাদের দেওয়ালগুলোকে যেন মনে হ'ল পিশাচের থাবা।

সবাই ওত পেতে আছে বাদশাকে ধরে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলবার জন্যে।

বাদশা টল্‌তে টল্‌তে চললেন নর্তকী মহলের দিকে।

আর কিছু নয়, আত্মবিস্মৃতিই তার প্রথম প্রয়োজন।

এদিকে বাদশার কক্ষে যখন গোপন দরবার বসেছিল—সঈদ ভাইয়েরাও নিষ্ক্রীয় ছিলেন না।

পাটনা থেকে ফরুরুকসিয়রকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থান দিয়েছিলেন সঈদ ভাইয়েরাই।

স্থান দিয়েছিলেন দিল্লীর সিংহাসনে একজন সম্রাটকে বসাবার জন্য নয়, তাদের একজন তাবেদারকে বসাবার জন্য।

ফরুরুকসিয়র নয়, হিন্দুস্থানই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

কিন্তু ফরুরুকসিয়র সিংহাসনে বসতে না বসতেই কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

সঈদ ভাইয়েরা তা' হতে দেবেন না।

ফরুরুকসিয়রের পতন অনিবার্য।

যত শীঘ্র সম্ভব এ পতন ঘটাতে হবে।

জিজিয়াকে ক্ষেত্র করে যে সুযোগ তাদের কাছে এসেছে, সে সুযোগ হেলায় হারাতে রাজি নন সঈদ ভাইয়েরা।

তাই তাঁরাও উঠে পড়ে লেগেছেন।

তাদের ঘরে আজ সলাপরামর্শ।

প্রথম তারা ডেকেছেন মহারাজা অজিত সিংহকে।

হুসেন আলি, আবদুল্লা আর অজিত সিংহ তিন ধূর্ত রাজনীতিবিদ্ বসেছেন মোগল সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলতে।

তিনেরই চোখে শৃগালের ধূর্ততা।

আবদুল্লা, মহারাজ অজিত সিংহকে বললেন,—মহারাজ, আপনি কি জিজিয়ার পক্ষপাতী?

উত্তর দিলেন অজিত সিংহ, হিন্দু হয়ে তা কি করে সম্ভব বলুন?

হুসেন আলি পরীক্ষা করবার জন্য বললেন, হতে পারে, কারণ আপনার জামাতা এ ব্যবস্থা করেছেন।

অজিত সিংহ বললেন, জামাতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সামাজিক নয় রাজনৈতিক।

আবদুল্লা প্রশ্ন করলেন, আপনি কি করবেন ঠিক করেছেন ?

—প্রতিবাদ করব।

—আর যারা প্রতিবাদ করবেন, আপনি নিশ্চয়ই তাদেরও সাহায্য করবেন ?

—নিশ্চয়ই।

আবদুল্লা বললেন, তবে জেনে রাখবেন আমরাও প্রতিবাদকারির দলে। হিন্দুস্তান ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র. এখানে কোন বিশেষ ধর্মের প্রাধান্য নেই। ধর্মীয় শাসন হিন্দুস্থানের পতনই ঘটাবে। সেই ধর্মীয় গোড়ামির উর্দ্ধে আমরা ফররুকসিয়রকে উঠাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা হল না। তিনি আমাদের অবিশ্বাস করে এনায়েৎ খাঁকে দলে টানলেন।

চুপ করলেন আবদুল্লা। অপর দু'জনও চুপ করে থাকলেন। কিছুকাল নীরবে কাটলে, আবদুল্লা আবার বলতে লাগলেন, আমাদের অবিশ্বাস করে ফররুকসিয়র শুধু আমাদেরই নয়, সমস্ত হিন্দু জাতির অপমান করেছেন। মোগল সাম্রাজ্যের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে আমরা এর প্রতিবাদ করতে চাই।

অজিত সিংহ বললেন, আপনারা মহৎ।

আবদুল্লা বললেন, যদি বর্তমান নীতির বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে আমাদের বাদশার বিরুদ্ধে যেতে হয় আপনি কি করবেন ?

অজিত সিংহ ধূর্ততায় সঈদদের চেয়ে কম নন।

কি বলতে চান আবদুল্লা খাঁ স্পষ্টই বুঝে নিলেন তিনি। বললেন, নীতি নিয়ে প্রশ্ন। সে ক্ষেত্রে ন্যায়ের পক্ষেই যাব।

—তা হ'লে মহারাজের সাহায্য পাব এটা আমরা বুঝতে পাচ্ছি ? মহারাজা নীরব থাকলেন। মৌনি সম্মতির লক্ষণ হলেও এক্ষেত্রে অন্যরকম মনে হ'ল। মহারাজার মনের গতি কোনদিকে সেটা বুঝে নিয়ে হুসেন আলী বললেন, সে ক্ষেত্রে আপনাকে রাজস্থানের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা বলে আমরা মেনে নেব, এবং আপনার যাতে···

কথা শেষ করতে দিলেন না আবদুল্লা। অন্যকথা পাড়লেন। রাজধানীর সমস্ত খবরই গোপনে সংগ্রহ করছিলেন সঈদ ভাইয়েরা। বাদশার কক্ষে গোপন দরবারের কথাও তাঁরা জানতে পেরেছিলেন। এবং একথাও জানতে পেরেছেন যে বাদশা মেবারের রাণাকে সাত হাজারী মনসব দিয়ে স্বপক্ষে টেনেছেন।

সেই কথাই বললেন আবদুল্লা, আপনি মেবারের রাণার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন ?

ঠিক বুঝতে না পেরে অজিত সিং বললেন, কেন বলুন তো ? তিনি তো জিজিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।

আবদুল্লা বললেন, হ্যাঁ, করেছেন, কিন্তু বাদশার বিরুদ্ধে তিনি যান নি।

—কি রকম ?

ওষুধ ধরেছে বলে মনে হল আবদুল্লার। মহারাজের মধ্যে ঈর্ষা জাগাবার জন্য বললেন, বাদশা রাণাকে সাত হাজারী মনসব দিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে যেন অজিত সিংহের মুখে একটা ছায়া নেমে আসল।

এটা লজ্জা, এটা তার অপমান।

ফরুকসিয়র তাঁর জামাতা হয়ে এটা করবেন তিনি ভাবতেও পারেন নি।

তাঁর সেই ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করে আবদুল্লা বললেন রাণা বাদশার পক্ষে যোগ দিয়েছেন। সম্ভবতঃ মহারাজকে অপমানিত করবার জন্যই এ ব্যবস্থা হয়েছে।

এ সময় হুসেন আলী বললেন, সুতরাং মহারাজের আমাদের পক্ষেই যোগদান করা উচিৎ নয় কি ?

আবদুল্লা বললেন, যদি আমাদের পক্ষে যোগ দেন তবে রাণার মন্‌সব আপনার হবে।

অজিত সিংহের মুখের দিকে তাকালেন আবদুল্লা।

অজিত সিং বললেন, আমার স্বার্থ রক্ষা করা হলে, নিশ্চয়ই আমিও আপনাদের স্বার্থ দেখতে ইতস্তত করব না।

হুসেন আলী বললেন, বেশ, তবে সে কথাই থাকল। আজ থেকে আপনি আমাদের দোস্ত হলেন।

পরস্পরে আলিঙ্গন করলেন ওরা তিনজনে।

আবদুল্লা বললেন, আপনার সাহায্য পেলে ফররুকসিয়রকে গদি-চ্যুত করতে দুদিনও সময় লাগবে না।

—মহারাজ বললেন, আমার সাহায্য আপনারা পাবেন।

অজিত সিংহের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হলেন সঈদ ভাইয়েরা।

তারা মহারাজকে আদর আপ্যায়নের পর বিদায় দিলেন।

মহারাজ অজিত সিংহ চলে গেলেন।

এবার দ্বিতীয় কাজ।

দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে নিজাম উলমুল্‌কের সঙ্গে একটা রফা করা।

দিল্লীর সঙ্গে আসন্ন সংগ্রামে নিজাম উলমুল্‌ককে বাদ দিয়ে চলা যায় না।

সুতরাং জয়লাভে নিশ্চিত হতে হ'লে তাকে হাত করা প্রথম প্রয়োজন।

সেই উদ্দেশে-দিল্লীতে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে নিজামকে।

মহারাজকে বিদায় দিয়ে নিজামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন হুসেন আর আবদুল্লা।

ব্যবস্থা অনুযায়ী কিছুকালের মধ্যেই নিজাম এলেন।

দু'ভাই যথাসম্ভব বিনয় সহকারে অভ্যর্থনা জানালেন নিজামকে।

এ অভ্যর্থনা বাদশাকেও দেননি তাঁরা কোনদিন।

নিজাম আসন গ্রহণ করতে করতে বললেন, কি খবর?

আবদুল্লা বললেন, খবর আপনার কাছে। এদিককার কথা জানেন তো?

—বলুন?

—ফর্‌রুকসিয়র সম্রাট হ'তে যাচ্ছেন।

নিজামের ঠোঁটের কোনে একটা বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠল।

—তাই নাকি?

—আজ্ঞে জনাব।

নিজাম বললেন, তা' জিজিয়া স্থাপনের পরামর্শটা দিলেন কে।

—এনায়েৎ খাঁ।

—ভাল কথা। তা' জিজিয়া আদায় করতে পারবেন কি?

—তিনিই জানেন।

—আপনার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয় এ ব্যবস্থা মুসলমানদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

—তা কি করবেন ঠিক করেছেন?

—তাই জন্যেই তো আপনাকে ডাকা।

নিজাম বললেন, আমার মতে এ কর উঠিয়ে দিতে হবে।

—বাদশা যদি না চান?

—বাদশাকে বাধ্য করতে হবে।

আবদুল্লা বললেন, বাদশা কিন্তু ব্যবস্থা করছেন।

—কি রকম?

—তিনি মেবারের রাণার সঙ্গে সন্ধি করেছেন।

—মেবার জিজিয়া মেনে নিল?

—না। মেবারের ক্ষেত্রে জিজিয়া মুকুব।

—এ তাহলে কেমন কর নির্ধারণ হল?

আবদুল্লা বললেন, ব্যাপারটা আসলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, আপনাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে।

নিজাম বললেন,—ব্যাপারটা সেরকমই দেখতে পাচ্ছি, তা' আপনারা কি করবেন ঠিক করেছেন ?

আবদুল্লা বললেন, ফর্রুকসিয়রকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না।

অচিরেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আপনার সাহায্য চাচ্ছি আমরা।

—কি রকম ?

—আপনার উদ্দেশ্য আমরা জানি। দাক্ষিণাত্যে আপনি স্বাধীন হতে চান। আমরা বাধা দেব না। উপরন্তু আপনাকে মালবের সুবেদার করে দেবার প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি। বিনিময়ে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

—বেশ, আমি প্রস্তুত।

—আবদুল্লা বললেন, আপনার অধীনে দশ হাজার মারাঠা সৈন্য রয়েছে। তা ছাড়া আপনার নিজের সৈন্যও রয়েছে। আপনি প্রয়োজনে আমাদের সাহায্য করবেন। আর যদি তত প্রয়োজন না হয়, নিরপেক্ষ থাকবেন এই আমাদের ইচ্ছা। বিনিময়ে হায়দেরাবাদ আর মালব আপনার

লোভনীয় প্রস্তাব। নিজাম পূর্ব থেকেই সম্মতি দিবেন বলে ঠিক করে এসেছিলেন।

ফর্রুকসিয়রকে অপসারণ তাঁরও প্রয়োজন। তিনি কথা দিলেন।

কোরাণ স্পর্শ করে তখন প্রতিজ্ঞা বিনিময় করা হ'ল।

ষড়যন্ত্রের আর এক চাল সার্থক হ'ল সঈদ ভাইদের।

হিন্দুস্থানের তক্তে তাউস তাঁদের হাতের মুঠির মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলেন ওরা।

মোগল ইতিহাসে আর এক নতুন অধ্যায় সূচিত হতে চলল।

মুসলমান ইতিহাসের এ নিত্যকালীন খেলা।

প্রতিজ্ঞা বিনিময় হ'লে নিজাম উঠলেন।

সঈদ ভাইয়েরা তাকে এমন বিদায় সম্বর্ধনা জানানেল যে বাদশারও তা' লোভনীয় মনে হত।

অভিভূত হয়ে ফিরলেন নিজাম।

এবার শেষ চাল চালতে হবে।

তারই জন্য প্রস্তুত হতে বস'লেন আবদুল্লা আর হুসেন আলী।

পনের

দিল্লী যখন জীবন মরণের খেলায় মেতে উঠেছে, উজির বাদশার চাল চলছে, সেই সময় বাদশা কিন্তু বিপদ বাধিয়ে বসলেন। অসুস্থ হয়ে পড়লেন বাদশা।

চিন্তায় চিন্তায় ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ফর্‌রুকসিয়র।

সেই চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পেতে তিনি মদ আর নারীর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাইলেন।

ফলে পুরানো রোগ দেখা দিল।

বাদশার সমস্ত খবরই রাখত পত্নী ফারুকউন্নিসা। সে একদিন শুনতে পেল, ক্লান্ত বাদশা রাজকার্যের নিষ্ঠুর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য পিয়ারা বাঈজীর স্মরণাপন্ন হয়েছেন।

প্রথমত সে তত কিছু মনে করেনি।

মোগল বাদশার বাঈজী সান্নিধ্য যেন রীতি হয়ে গিয়েছিল নর্তকীমহল মানে এই নয়—যে প্রধানা বেগমকে অস্বীকার। ফারুক-উন্নিসা ভেবেছিল ক্লান্ত বাদশা স্ফূর্তির পরিবেশে নিজেকে উজ্জীবিত করে নিয়ে আবার তারই কাছে ফিরবেন।

ফররুকসিয়র প্রেমকে অবমাননা করতে পারে না। কিন্তু দিনে দিনে সে ধারনা পাল্টাতে লাগল ফারুকউন্নিসার। প্রেমের প্রতি পুরানো শ্রদ্ধা জানাবার কোন আগ্রহই দেখা গেল না সম্রাটের। বরং দিনের পর দিন তিনি তার দায়িত্ব, প্রেম, সব ভুলে নর্তকীমহলে পড়ে থাকতে লাগলেন।

কিন্তু সম্রাটের তখন নিতান্ত প্রয়োজন।

এনায়েৎ খাঁ আর মিরজুমলা ভয় পেলেন।

ওদিকে সঈদ ভাইয়েরা প্রস্তুতি-পর্ব চালিয়ে যাচ্ছে।

যে কোনদিন তাদের অসন্তুষ্টি বিদ্রোহের আকার ধারণ করতে পারে।

এ সময় সম্রাটকে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকলে চলবে না।

কিন্তু চেষ্টা করেও সম্রাটের সাক্ষাৎ তাঁরা পেলেন না।

সম্রাট ক্লান্ত।

রাজনীতি নিয়ে আর নিজেকে বিব্রত করতে রাজি নন তিনি!

অনুপায়ে এনায়েৎ আর মিরজুমলা প্রধান বেগম হজরৎ ফারুক-উন্নিসার সঙ্গে দেখা করলেন।

এতদিনে ফারুকউন্নিসারও চৈতন্য হয়েছিল।

সে বুঝতে পেরেছিল যে সিংহাসন পেয়ে সম্রাটের মধ্যে নীল রক্তের ক্রীয়া সুরু হয়েছে।

সেও বুঝতে পেরেছিল সম্রাট রাজকার্যের দায়িত্বকে এড়াতে চাচ্ছেন।

কিন্তু এই মুহূর্তে পালিয়ে থাকলে মৃত্যু অবধারিত।

সুতরাং বাঁচবার জন্য একটা কিছু করা প্রয়োজন।

সাড়া দিল সে আমীরদের ডাকে।

অবশেষে সে দেখা করল মিরজুমলা আর এনায়েৎ খাঁর সঙ্গে।

মিরজুমলা বললেন, হজরৎ সহিবাকে কষ্ট দিলাম।

মোলায়েম করে উত্তর দিলেন ফারুক, না কষ্ট কেন। আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। বলুন।

মিরজুমলা বললেন,—জাহাপনা আমাদের বিপদে ফেলেছেন। প্রয়োজনের সময়ে তিনি এখন রাজকার্য থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।

ফারুকউন্নিসা বললেন, সেটা অন্যায়।

একটু তোয়াজের ভঙ্গিতে এনায়েৎ বললেন, জাহাপনা হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রতিবাদ করে উঠলেন ফারুকউন্নিসা, না। ক্লান্তির প্রশ্ন অবান্তর। রাজকার্য গুরুদায়িত্ব এটা জেনেই তিনি সিংহাসনে এসেছেন। এখন পিছিয়ে গেলে চলবে না।

—হয়তো পিছিয়ে যাননি, ত্বদিন বিশ্রাম নিচ্ছেন।

—না, বিশ্রামের অবসর নেই বাদশার। বাদশার গদি বিলাসের স্থান নয়। আত্মউপভোগের জন্য সিংহাসনে বসেনা লোকে। সিংহাসন একটা দায়িত্ব, কর্তব্য। নিজের সুখকে বিসর্জন দিয়েই এখানে আসতে হয়। যারা তা পারেন না, তাঁরা ভুল করেন। সম্রাট কর্তব্য থেকে পিছিয়ে আসলে মৃত্যু তার অবধারিত। জাহাপনাকে ফেরাতে হবে।

একটুখানি ইতস্ততঃ করে মিরজুমলা বললেন, সেই জন্যেই হজরৎ সাহিবার কাছে আসা। সঈদ ভাইয়েরা যখন বাদশাকে আক্রমণ করবার জন্য উদ্দ্যত, তখন বাদশা আত্মবিস্মৃত। আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছি তাকে নর্তকী মহল থেকে ফিরিয়ে আনবার, কিন্তু তিনি কোন কথা শুনতে রাজি নন।

একটু গম্ভীর হলেন যেন ফারুকউন্নিসা। বললেন, আমায় কি করতে হবে বলুন?

—আপনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে বাদশাকে।

—আমি কি পারব?

মিরজুমলা বললেন, একমাত্র আপনিই পারবেন, আর কেউ নয়। আপনাকে বাদশা পেয়ার করেন সবার চাইতে বেশী।

ফারুকউন্নিসা বললেন, সেদিন আর আছে কিনা কে জানে। তবু চেষ্টা করে দেখব।

—তাহলে আমরা আশা নিয়ে ফিরতে পারি ?

—সবই খোদার ইচ্ছা। তাঁর দয়া থাকলে হয়তো বাদশা আবার সুমতি ফিরে পাবেন।

একটু যেন আশ্বস্ত বোধ করলেন মিরজুমলা আর এনায়েৎ। ওরা ফিরে গেলেন।

গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলেন ফারুক।

আর তাঁর ভিতর কান্নার ঢেউ উথলে উঠতে লাগল। কেন এমন হ'ল ? বাদশা কি তার ভালবাসার কথা ভুলে গেলেন ?

হায় আল্লা তুমি তাকে সুমতি দাও।

আল্লার কাছে সেই মুহূর্তে মনেপ্রাণে সমস্ত প্রার্থনা জানাল ফারুকউন্নিসা। দৈব ব'লে কোন জিনিষ আছে কি না কে জানে।

হয়তো যা আকস্মিক দুর্ঘটনা, তাকে আমরা দৈব দিয়ে বিচার করতে চাই বলে অদৃশ্য এক ভাগ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কিম্বা হয়তো সত্যি দৈব ব'লে কোন জিনিষ আছে।

অন্তত ফারুকউন্নিসার সেই প্রার্থনার মুহূর্তে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা সত্যিই বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা চলে না।

সেই মুহূর্তে বাদশা ছিলেন নর্তকী মহলে।

নীলরক্তের বিষে পিয়ারা বাঈজীকে তিনি দেখছিলেন বেহেস্তের হুরীর মতন।

আর উগ্র মদিরার স্পর্শে তিনি সেই বেহেস্তের হুরীর সঙ্গে উড়ে চলেছিলেন যেন।

দিনে দিনে পিয়ারী বাঈ-র প্রতি তার কামনা আর নর্তকীমহলের প্রতি আকর্ষণ যেন বেড়েই চলেছিল।

যখনই তিনি ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তের কোন আভাষ পেয়েছেন মিরজুমলা বা এনায়েৎ খাঁর কাছ থেকে, তখনি সুরার প্রতি তার তৃষ্ণা

আর পিয়ারীর জন্য তার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গিয়েছে। হয়তো কোন মনোস্তাত্ত্বিক কারণের জন্যই এসব ঘটেছে।

যতই তিনি ভয় পেয়েছেন, ততই তিনি নিজেকে ভুলবার চেষ্টা করেছেন। কিছুটা পিয়ারার চোখেও পড়েছে ঘটনাটা।

সেও যেন দেখছিল, বাদশা দিনের পর দিন কেমন একটা কৃষ্ণ বিষাদে আচ্ছন্ন হচ্ছেন।

তার গান, তার নৃত্য যেন ঠিক বাদশার উপভোগের জন্য নয়, আত্ম প্রবঞ্চনার জন্য।

বাদশার গোপন মনে কোথায় যেন একটা লুকান ব্যর্থতা ছিল।

বাদশার এ প্রচেষ্টা যেন সেই ব্যর্থতা ভুলবার জন্যই।

তাই একদিন সেই বলেছিল, খোদাবন্দ ?

ঘোলাটে চোখে বাদশা বলেছিলেন, বল।

কসুর মাপ করবেন, একটা কথা বলছি, নর্তকী মহলে আপনি আসবেন না।

আশ্চর্য্য হয়ে যেন বাদশা তাঁকিয়েছিলেন তার দিকে, কেন ?

পিয়ারা বলেছিল, আমার মনে হচ্ছে এতে আপনার আকর্ষণ নেই। শুধু নিজেকে বঞ্চনা করছেন আপনি।

একটু হেসেছিলেন বাদশা, বলেছিলেন, কেন ? তোমাকে কি আমি অবজ্ঞা করেছি ?

—না, ঠিক তা নয়। তবু আমি নারী, পুরুষকে দেখলেই বুঝতে পারি, সে কি চায়। কোন দৃষ্টিতে কামনা রয়েছে, কোথায় রয়েছে বঞ্চনা।

বাদশা আর বেশী বলতে দেননি তাকে। দুটি বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে, কি জানি কি ভেবে সেদিনই প্রথম পিয়ারাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ছিলেন। সুপুরুষ ফরূরুকসিয়রের বুকের মধ্যে পিয়ারা নিজের নারীত্ব উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছিল সেদিন।

কিন্তু ফরূরুকসিয়রের হৃদয়ের কিনারা সে পায়নি।

কিন্তু বাদশার প্রতি ক্ষমতা এসে গিয়েছিল তার।

তাই মদিরা আর মোহের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্য সে চেষ্টা করেছিল।

দিন দিন বাদশার বিমর্ষতা বেড়ে যেতে দেখে সে নিজেকেও বেদনার্ত বোধ করছিল।

সেদিন ফারুকউন্নিসার কাছে যখন আমীরেরা গিয়েছিলেন দরবার করতে, বাদশা সেদিন নিতান্ত মলিন ভাব নিয়ে এসেছিলেন পিয়ারা বাঈজীর কাছে।

দেখেই যেন শিউরে উঠেছিল পিয়ারা, বলেছিল, কি হয়েছে মেহেরবান?

একটু ক্লান্ত হাসি হেসে ফররুকসিয়র বলেছিলেন, না, কিছু নয়!

প্রতিবাদ করেছিলেন পিয়ারা, না, কিছু একটা হয়েছে। আপনি অসুস্থ খোদাবন্দ। আপনি বিশ্রাম নিন।

বাদশা বলেছিলেন, না, তুমি গান গাও, তবেই আমি সেড়ে উঠব।

গান গাইতে চায়নি পিয়ারা, কিন্তু বাদশা জোর করেছিলেন। অগত্যা জীবনের উন্মাদনা ফুটাতে হয়েছিল তাকে সুরের মধ্য দিয়ে।

যখন সুরের আবেশে সমস্ত ডুবে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার করে উঠেছিলেন বাদশা। ত্রস্ত পদে ছুটে এসে বাদশাকে জড়িয়ে ধরেছিলো পিয়ারা; কি হয়েছে খোদাবন্দ?

ঘামছিলেন তখন ফররুকসিয়র।

কি একটা তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন তিনি।

পিয়ারা জিজ্ঞেস করেছিল, কি খোদাবন্দ?

শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলেন বাদশা, ব্যথা।

সেই পুরানো রোগ বেড়ে উঠেছিল বাদশার।

মারাত্মক অর্শ আক্রমণ করেছিল তাঁকে।

পিয়ারা জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি হারেমে যাবেন?

ক্লান্ত ভাবে বলেছিলেন ফররুকসিয়র, হ্যাঁ, পিয়ারা।

এটা ঘটনা কিম্বা দৈব, আল্লাহ জানতেন, কারণ সেই মুহূর্তে ফারুকউন্নিসা একান্ত মনে খোদার কাছে স্বামীর জন্য প্রার্থনা করেছিল। তাঁকে ফিরিয়ে দিতে বলেছিল।

রুগ্ন ফরুরুকসিয়র ফিরে এসেছিলেন।

ষোল

বাদশার রোগ কিন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথেই চলল। শেষে জীবনের উপর আঘাত হানবার মত হ'ল।

রাজ্যের হেকিম আসলেন।

দেশ বিদেশের বৈদ্যরা পরীক্ষা করলেন সম্রাটকে।

না, রোগ বড় কঠিন।

ঔষধে সারবার রোগ নয়।

শাল্য চিকিৎসার প্রয়োজন।

অস্ত্রোপচার ভিন্ন উপায় নেই।

কিন্তু বিপদ দেখা দিল এই যে, অস্ত্রোপচার হলে বাদশা চিরকালের মত পুরুষত্ব হারাবেন. তা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

বাদশা রাজী হতে চাইলেন না এতে, কিন্তু ফারুকউন্নিসা এবং অন্যান্য বেগমেরা জোর করলেন।

স্বামীর বেঁচে থাকাটাই তাদের তখন বেশী প্রয়োজন।

অবশেষে বাদশা রাজি হলেন।

অস্ত্রোপচার হল।

বাদশা রোগ মুক্ত হলেন, কিন্তু হারালেন পুরুষত্ব।

বেগমরা আনন্দিত হলেন, কিন্তু অন্ধকার নেমে আসল ফরুরুক-সিয়রের জীবনে।

চিরদিনের মত আনন্দ হারালেন তিনি জীবন থেকে।

অবশ্য তাঁর পুরুষত্ব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা হ'ল অনেক।

হেকিমী হালুয়া, কস্তুরী দেওয়া পান. ও উত্তেজক দাওয়াই খেয়েও তিনি পুরুষত্ব ফিরে পেলেন না।

প্রিয়তমা বেগম ফারুকউন্নিসা সান্ত্বনা দিলেন, কি হয়েছে খোদাবন্দ ? বিমর্ষ হচ্ছেন কেন ?

শুধু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন বাদশা. না, হারেমে আর আমার আসা চলবে না।

—কেন ?

নিরুত্তর থাকলেন বাদশা।

ফারুকউন্নিসা বললেন, হারেমে আপনার বেগমেরা রয়েছে। বেগম তো শুধু দৈহিক উপভোগের জন্য নয়। তাঁরা যে জীবনের সঙ্গিনী। সুখ এবং দুঃখ দুইয়েই অংশীদারিনী। সুখের দিনে আপনার সুখ তারা ভাগ করে নিয়েছে। দুঃখের দিনে আপনার দুঃখকে তারা গ্রহণ করবে না ?

শুধু অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন বাদশা, না ফারুক. সে বড় লজ্জা। হারেমে আর আমি প্রবেশ করবো না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ফারুক বলেছিল, তবে কোথায় যাবেন জাহাপনা ?

বাদশা বলেছিলেন, নিজেকে ভুলাতে হবে।

—কি ?

—আকর্ষনে।

ভয় পেয়েছিল একটু ফারুক আবার কি বাদশা নর্তকী মহলে যাবেন ? বলেছিল, কিসের আকর্ষণ জাহাপনা।

উত্তর দিয়েছিলেন বাদশা, তা, জানিনা। তবে তা খুঁজে বের করতে হবে।

ফারুকউন্নিসা বলেছিল, রাজকার্য্যের মধ্যেই কেন ডুবে যান না খোদাবন্দ ?

—না, ভাল লাগে না। ঘৃণা করি আমি রাজকার্য্যকে।

—কিন্তু আপনি ত এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ?

হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বাদশা। তার দুর্বল স্নায়ু উত্তেজনা-প্রবণ হয়ে উঠেছে। কিছু বললেন না।

বাদশার এ ভাব লক্ষ্য করল ফারুক। তাই তাঁকে আর বিরক্ত না করে স্বাধীন ভাবেই চলতে দিল।

বাদশা বেরিয়ে আসলেন।

সেই দিকে তাকিয়ে উঠতেই ভবিষ্যৎকে দেখতে পেল ফারুক, মৃত্যু।

সিংহাসন নিষ্ঠুর—বসলে ফিরে যাওয়া যায় না।

ফিরে যেতে চাচ্ছেন ফর্‌রুকসিয়র, পতন তার অনিবার্য্য।

বেরিয়ে আসলেন বাদশা।

কিন্তু নর্তকী মহলে গেলেন না আর।

সত্যি, নতুন এক পথ উদ্ভাবন করলেন জীবনকে উপভোগ করবার জন্য।

ঘোড়ার সখ ছিল বাদশার।

দেশ বিদেশ থেকে নানা রকম ঘোড়া আনাতেন তিনি। ইরাকী, আরবী, কোন ঘোড়াই বাদ যেত না তার।

দেশ বিদেশের অশ্বে পূর্ণ তার আস্তাবল।

হারেমের পথ বন্ধ হওয়ায় সেই ঘোড়ার সখ বাড়ল বাদশার। আরো ঘোড়া আনালেন তিনি।

ঘোড়ার এক জগৎ সৃষ্টি হ'ল প্রাসাদে।

সমস্ত দিনরাত তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল ঘোড়া। দিনে তাদের যত্ন আত্তি দেখতেন তিনি।

রাতে তাঁর শোবার ঘরের নীচে ঘোড়া বেঁধে রাখা হ'ত। নিশীথ রাত্রে জেগে উঠে অশ্বখুরের ধ্বনি শুনতেন।

কিন্তু এই ভাবে জীবনকে ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়। মনের মধ্যে অশান্তি তাঁর বেড়েই চলল।

আরো বাড়ল—যেদিন মিরজুমলা আর এনায়েৎ খাঁ সঈদ ভাইয়েদের আসন্ন মতিগতির কথা তাঁকে জানালেন। বাদশা একটা ইরাকী ঘোড়া দেখছিলেন, সেই মুহূর্তে সংবাদ পরিবেশন করলেন মিরজুমলা।

মিরজুমলাকে দেখে প্রথমটা আমল দিতে চান নি বাদশা।

সাম্রাজ্যের ব্যাপারে আর কোন কথা শুনতে রাজি নন তিনি। কিন্তু বিপদ তখন ভয়ানক। না বললেও মিরজুমলার চলবে না।

মৃত্যুর খর্গ তখন বাদশা আর তাঁর বান্দারের উপর উদ্যত।

মিরজুমলা তাঁকে জানালেন, জাহাপনা, সঈদ ভাইয়েরা প্রাসাদ আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মহারাজ অজিত সিংহ আর নিজাম-উল্‌মুল্‌ক।

দেখতে দেখতে বাদশা কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেলেন। কিছু যেন করতে পারলেন না। সঈদ ভাইয়েরা এত দ্রুত কোন ব্যবস্থা করবেন এটা ভাবতে পারেন নি তিনি।

মিরজুমলা বললেন, একটা ব্যবস্থা করুন,—না হ'লে আমাদের সবারই মৃত্যু নিশ্চিত।

ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন বাদশা, কি করব বলুন ?

এখনো আপনাকে যারা সাহায্য করতে প্রস্তুত তাদের দলে টানুন।

—কার সাহায্য পাওয়া যাবে ?

মিরজুমলা বললেন, আমরা অনেক চেষ্টা করে অম্বরাজ জয়সিংহ আর বুন্দিশ্বরের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। কিন্তু বিনিময়ে জিজিয়া উঠিয়ে নিতে হবে।

বাদশা বললেন, বেশ তাই করুন।

—চেষ্টা করলে মেবারও আমাদের দলে আসবে। সেখানে একজন দূত পাঠিয়ে দিন।

বাদশা অনুমতি দিলেন, বেশ পাঠিয়ে দিন। আর ?

—এই মুহূর্তে দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিন। সংবাদ পেয়েছি হুসেন আলী নিজামের সঙ্গে সেনা বাহিনী নিয়ে সদলে কেল্লা অবরোধ করতে আসছে।

দুর্গদ্বার বন্ধ করতে অনুমতি দিলেন বাদশা।

বেশ বন্ধ করুন।

মিরজুমলা বললেন, আরো একটি কাজ করতে হবে।

—বলুন ?

—চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আবদুল্লা আর মহারাজ অজিত সিংহকে বাইরে যেতে দেবেন না। তারা এখন দুর্গেই রয়েছেন।

বাদশা স্বীকার করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ দ্বার বন্ধ করা হ'ল।

দুর্গ দ্বার বন্ধ করে দেবার পর অম্বর, বুন্দি আর মেবারকে খবর পাঠান হ'ল। অম্বর এবং বুন্দি বাদশাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে রাজপুত দেহরক্ষী রাখা হ'ল বাদশার জন্য।

রাজধানীতে তখন আবদুল্লা আর অজিত সিংহ ছিলেন।

তারা এ সংবাদ পেলেন।

ফরুকসিয়রকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য তখন হুসেন আলী নিজামের সঙ্গে মিলিত হয়ে লালকেল্লার পথে এগিয়ে আসছিলেন। অম্বর এবং বুন্দির হাবভাবে ওরা ভয় পেলেন।

হুসেন আলীকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে পথিমধ্যে যেন সে রাজপুতদের বাধা দেয়। দিল্লীতে ওরা যেন পৌছাতে না পারে। প্রথমত যেন বুঝিয়ে দলে ভেরানর চেষ্টাই করা হয়। না হলে বল প্রয়োগ করতে নির্দ্দেশ দিলেন।

আবদুল্লা নিজে বাদশার সঙ্গে দেখা করে তাকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করলেন।

সেই সঙ্কট মুহূর্তে বাদশা যখন নিতান্ত ব্যস্ত, আবদুল্লা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

মিরজুমলা আর এনায়েৎ খাঁ অবশ্য তাঁকে দেখা করতে মানা করলেন, কিন্তু স্নায়োবিক দৌর্ব্বল্যে ভুগছেন তখন বাদশা; তিনি দিশেহারা হয়ে আবদুল্লার সঙ্গে দেখা করলেন।

আবদুল্লা তাঁকে অতি বিনয়ের ভঙ্গিতে বললে, একি করছেন জাহাপনা?

—কি?

—আপনি অম্বর আর বুন্দির রাজপুতদের দিল্লী থেকে নিয়ে এসেছেন?

রাজপুত দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছেন:

বাদশার তখন বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। বললেন হ্যাঁ।

—শুনলাম আপনারা আমাকে বন্দী করতে চান?

হাসলেন আবদুল্লা. কুটনৈতিক চাল চাললেন। বললেন, জনাব. একেই বলে তক্‌দির। আপনার জন্য যারা জীবনপণ করে আছে আপনি তাদের অবিশ্বাস করেছেন।

হতবুদ্ধি বাদশা বললেন. কি রকম?

আবদুল্লা উত্তর দিলেন, আপনি আমাদের পরামর্শ না নিয়ে জিজিয়া স্থাপন করেছেন। তারই ফলে রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। সমস্ত হিন্দুরা আজ ক্ষিপ্ত। আমরা সংবাদ পেয়েছি রাজপুতরা প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে মিত্রের ছদ্মবেশে দিল্লীতে প্রবেশ করছেন।

চমকে উঠলেন বাদশা, সত্যি?

আবদুল্লা বললেন, সত্যি বই মিথ্যে বলে কোনদিন সঈদ ভাইয়েরা। মনে করে দেখুন পাটনাতে একদিন বলেছিলুম দিল্লীর মসনদে বসবেন. বসিয়েছি কিন্তু……

ভয়ানক যেন মুষড়ে পড়লেন ফর্‌রুকসিয়র, বললেন, তাহলে কি করব বলুন ?

—আমার পরামর্শ কি আপনি শুনবেন ?

—নিশ্চয়ই শুনব। আল্লার নামে শপথ করছি।

আবদুল্লা বললেন, তাহলে জাহাপনা এই মুহূর্তে রাজপুত দেহ-রক্ষীদের বরখাস্ত করুন। ওরা দিল্লী আসবার পূর্বে এ কাজ করতে না পারলে পরে আর পারা যাবে না।

—বেশ তাই হবে।

ফর্‌রুকসিয়র সেই মুহূর্তে রাজপুতদের বরখাস্তের আদেশ দিলেন। শুনে মিরজুমলা আর এনায়েৎ খাঁর মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। আবদুল্লা রাজপুতদের পরিবর্তে নিজের সৈন্যদের সম্রাটের দেহরক্ষী করে দুর্গের ভীতর প্রবেশ করলেন।

সেই মুহূর্তে দিল্লীর পথে রাজপুত বাহিনী এসে সারবল সেরাই-তে থামল।

সেখানে হুসেন খাঁর আর আবদুল্লার সঙ্গে তাদের দেখা হ'ল।

বুন্দির রাওরাজা আর জয়সিংহ সবার কাছেই দূত পাঠালেন তারা। আর নিজেদের দলে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি বরং বুন্দির রাওরাজকেও অনুরোধ করলেন বাদশার সাহায্যে এগিয়ে আসতে।

জয়সিংহ রাজি হলেন না।

কিন্তু রাওরাজা তখন কুতুব-উল-মুলুকের দূতের সঙ্গে যোগদান করেছেন। বিনিময়ে কিছু ঘোড়া পেয়ে অজিত সিংহের বাহিনীর সঙ্গে মিশে গেলেন।

সঈদ ভাইয়েদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি।

ইত্যবসরে হুসেন আলীর বাহিনী দিল্লীর কাছে চলে এসেছে।

অম্বরাধিপতি ফর্‌রুকসিয়রকে অনুরোধ করলেন দুর্গের বাহিরে এসে হুসেন আলীকে বাধা দেবার জন্য। বললেন সম্রাট শুধু উপস্থিত

থাকুন। যুদ্ধ করব আমি। সৈন্যদের মনোবল রাখবার জন্য সম্রাটের উপস্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু বুদ্ধিভ্রষ্ট সম্রাট তাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

অস্বীকার করলেন তিনি। বললেন, না, থাক। আমি অন্য ব্যবস্থা করছি।

বাধ্য হয়ে জয়সিংহ দেশে ফিরে গেলেন। যাবার আগে শুধু একবার হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলেন কেল্লাতে। মোগল গৌরবরবি অস্ত যেতে চলেছে।

শেষ ভরসা রাজপুতদের সাহায্য পেলেন না বাদশা।

নিজের ধ্বংশের পথ নিজেই প্রশস্ত করলেন।

অপর পক্ষে দেখতে দেখতে হুসেন আলীর বাহিনী লালকেল্লা ঘিরে দাঁড়াল। উন্মত্ত সৈন্যদের চিৎকারে দিল্লীর আকাশ কেঁপে উঠল, প্রকৃত ব্যাপারটা আর বুঝতে বাঁকি থাকল না হতবুদ্ধি বাদশার। বুঝলেন যে নিজের সর্বনাশ নিজে করেছেন।

তিনি শেষ আশ্রয় খুঁজলেন হারেমের গোপন কক্ষে।

সেই মুহূর্তে ফারুকউন্নিসার কথা মনে পড়ল তাঁর।

গিয়ে দাঁড়ালেন উপেক্ষায় ম্রিয়মান পত্নীর কাছে।

তাঁকে দেখে শুধু স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকল ফারুক! যেন ছটো পাথরের নিস্পলক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকল শুধু বাদশার দিকে। সে চোখে রাগ নেই, দ্বেষ নেই, তিরস্কার নেই, রয়েছে শুধু অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কাছে নীরবে নতি স্বীকার করা প্রশান্তি।

বাদশা যেন কেঁদে উঠলেন, সর্বনাশ হয়েছে ফারুক।

স্থিরভাবে বলল বেগম, জানি।

হতবুদ্ধি বাদশা বললেন, কি করব?

ফারুক বলল, করবার এখন আর কিছু নেই জাহাপনা। সিংহাসন আপনাকে ত্যাগ করেনি আপনিই সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। এ'ত আপনার নিজের হাতে সৃষ্টি।

সিংহাসনের কথা বাদশার তখন মনে নেই। জীবন তখন বড় কথা। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়াই তখন বড় কথা। বললেন, ওরা যে আমাকে হত্যা করবে ফারুক।

ফারুক বলল, আল্লার যদি ইচ্ছা হয়—তবে তাই হবে।

তা শুনে অসহায় একটা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন বাদশা।

ফারুক বলল, আল্লার ইচ্ছা পূর্ণ হলেও আমাদেরও কর্তব্য আছে। ভয় নেই জনাব। যতক্ষণ প্রাণ আছে আশা ত্যাগ করব না। আপনাকে রক্ষার চেষ্টা করব।

—কিন্তু কি করা যাবে।

—হয়তো কিছু এখনো করা যেতে পারে। হারেমে অসংখ্য প্রাসাদ মালার মাঝে এমন নিভৃততম স্থান রয়েছে, এমন গোপন আশ্রয় রয়েছে, যার সন্ধান বাইরের লোকের জানা নেই। সেই গোপন কক্ষেই স্বামীকে লুকিয়ে রাখবার কথা ভাবছিল ফারুক।

স্বামীকে বলল, আসুন জাহাপানা, আপনাকে হারেমের গুপ্ত কক্ষে নিয়ে যাই। অন্তত আপনার জীবন রক্ষা পাবে।

হায় ভাগ্যের কি বিদ্রূপ!

পরাক্রান্ত দিল্লীর বাদশা আজ চোরের মত স্ত্রীর ওরনার অঞ্চল ধরে অন্দর মহলে পালাতে বাধ্য হচ্ছেন।

বেগমের অনুসরণ করে বাদশা জেনানা মহলে প্রবেশ করলেন।

যে জেনানা মহলকে তিনি অবজ্ঞা করে একদিন নর্তকী মহলে অবস্থান করেছিলেন, ভাগ্যের পরিহাসে সেই জেনানা মহলে তাঁকে ফিরে আসতে হ'ল।

নিভৃতকক্ষে বাদশাকে গোপনে রেখে দিল ফারুক। বলল, চুপ করে থাকবেন। কোন মতেই সাড়া দেবেন না। একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ এ কক্ষের সন্ধান জানে না।

বাদশা হতচেতন ব্যক্তির মত নীরব হয়ে থাকলেন।

যে জীবন রক্ষা করতে স্বয়ং বাদশা অপারগ হয়েছেন, বেগম সেই জীবন রাখবার জন্য সচেষ্ট হলেন।

হারেমের নিভৃত আশ্রয় ছেড়ে রাজনীতির আশ্রয়ে বেরোতে চাইলেন।

সেই মুহূর্তে ফারুকের যার কথা মনে হ'ল সে হ'ল সপত্নী রায় ইন্দর কুনয়ার।

বাদশার এই বিপদে একমাত্র সেই আশ্রয়।

মহারাজ অজিত সিংহ নিজে জামাতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। কন্যার অশ্রুজলে যদি তিনি টলেন তবেই রক্ষা।

একমাত্র রাঠোর শক্তিই আজ সঈদ ভাইদের হাত থেকে বাদশাকে রক্ষা করতে পারে।

রায় ইন্দর কুনয়ারের কাছেই চললেন ফারুকউন্নিসা। বিপর্য্যয়ের খবর তখন কোথাও ছড়িয়ে পড়তে বাকী নেই।

নববিবাহিতা বধুর ঘরেও তার নিষ্ঠুর ছায়া পড়েছিল। সেই ছায়ায় একটা বিষণ্ণ প্রতিমার মত শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল রায় ইন্দর কুনয়ার।

ফারুকউন্নিসাকে দেখেই সে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল।

হিন্দু মেয়ে সে।

জীবনে স্বামী অপেক্ষা বড় করে কাউকে চেনেনি সে। ফর্‌রুকসিয়রের বিপদে চোখে অন্ধকার দেখছে সে।

ফারুকউন্নিসাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল ইন্দর। প্রথমা বেগম ফারুকউন্নিসা, গৃহের সমস্ত দায়িত্ব আজ তাঁরই।

তাই সস্নেহে নববধূকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, কেঁদো না বহিন। বিপদে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না।

বিপদের মুখে প্রতিরোধের শক্তি নিয়ে আজ আমাদের দাঁড়াতে হবে।

কান্নায় ভেঙে পড়েই বলল কুনয়ার, কি করব বহিন?

ফারুকউন্নিসা বলল, অনেক কিছুই করবার আছে। এই বিপদে তোমার কর্তব্যই সব চাইতে বেশী।

—বল কি করতে হবে ?

ফারুক বলল, তোমার পিতাজী মহারাজ অজিত সিংহ। তিনি এই দুর্গের মধ্যেই রয়েছেন। কিন্তু তিনি নির্বিকার দর্শক। সম্ভবতঃ শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এবার তিনি যদি শুধু সরে দাঁড়ান, সঈদ ভাইদের তিনি যদি শুধু বাধা দেন, রক্ষা। সে ছাড়া সম্ভব নয় বহিন।

—বল আমি কি করব ?

ফারুকউন্নিসা বলল তুমি যাও। তুমি নিজে তোমার পিতাজীর সঙ্গে দেখা কর। তোমার চোখের জল তিনি উপেক্ষা করতে পারবেন না।

অনভিজ্ঞ শিশুর মত প্রশ্ন করল কুনয়ার, কোথায় তিনি ?

—দেওয়ানী আমে। এই মুহূর্তে তুমি সেখানে যাও বহিন। আর দেরী করলে বিপদ।

উন্মাদের মত তখনি বেরুবার চেষ্টা করলেন কুনয়ার।

ফারুক বলল, দাঁড়াও, বাঁদিকে নিয়ে যাও।

বাঁদীকে ডাকা হ'ল।

বাঁদী সেলাম জানিয়ে দাঁড়ালে ফারুক বলল, বেগমকে দেওয়ানী আমে নিয়ে যা। এক্ষুনি।

বড় বড় চোখ করে শুধু তাকিয়ে দেখল বাঁদী।

কিন্তু নড়তে পারল না সে।

—কি দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? যা। এক্ষুনি।

বাঁদীও যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, বলল, কিন্তু দেওয়ানী আমের পথ যে বন্ধ বেগম সাহেবা। আমাদের খাঁ সাহেবের সিপাইরা মহল আটক করেছেন।

অত্যন্ত দুঃখের মধ্যেও একটু হাসল, ফারুক। আল্লা বিরূপ হয়েছেন। তার আর কিছু করবার নেই।

কিন্তু কেঁদে উঠল কুনয়ার।

বাদশাকে হঠাৎ হারেমের অভ্যন্তরে যেতে দেবার ইচ্ছে ছিল না আবদুল্লার।

তিনি শুধু অপেক্ষা করছিলেন হুসেন আলীর আগমনের। হঠাৎ বাদশার হারেমে পলায়নের খবর পেয়ে তিনি একটু অপ্রস্তুত হলেন।

শিগ্‌গীর কাজ হাসিল করতে হবে।

বাদশাকে হারেমে পালিয়ে থাকতে দেওয়া চলবে না।

লোভ দেখানোর চেষ্টা করলেন আবদুল্লা, বলে পাঠালেন. জাহাপনার ভয় নেই। হুসেন আলী এসে গিয়েছেন। তিনি নিরাপদ। এবার দেওয়ানি আমে এসে তিনি দরবারে বসুন। অন্ধকারের মধ্যেও লোভের হাতছানি দেখা যায়—তাই বিশ্বাস করতে গিয়ে আবার লুব্ধ হতে যাচ্ছিলেন বাদশা।

কিন্তু এবার তিনি একা নন।

বেগমেরা ঘিরে পাহারা দিচ্ছেন তাঁকে।

ফারুকউন্নিসা বলল, না জাহাপনা আর বিশ্বাস করবেন না ওদের। ওরা আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চায়। আপনি হারেমে লুকিয়ে থাকুন ওরা সন্ধানও পাবে না।

বাদশা তাই আত্মগোপন করে থাকলেন।

জবাব লিখে পাঠালেন আবদুল্লাকে। বললেন, এই মুহূর্তে হুসেন আলী তার বাহিনী নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করুন। যদি তা না হয়, বাদশা এমন শাস্তি দেবেন যা কোন দিন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

কিন্তু সেটা তখন ছিল শুধু নির্বিষ ভুজঙ্গের ব্যর্থ আস্ফালন। করবার নেই কিছু আর।

ওদিকে আমির-উল-ওমরা হুসেন আলী কিন্তু দুর্গের বাইরে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছিলেন।

তাঁর ধারণা ছিল দিল্লী পৌঁছানো মাত্র ফর্‌রুকসিয়র সিংহাসন চ্যুত হবেন।

তিনি আবদুল্লাকে জানালেন, আর দেরী হলে তিনি লালকেল্লার ভেতর বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়বেন।

সমস্যায় পড়ে গেলেন আবদুল্লা।

তাড়াতাড়ি একটা কিছু করা প্রয়োজন।

ফর্‌রুকসিয়র সিংহাসনে আরোহণ-কালীন যে শাহজাদারের বন্দী করে রেখেছিলেন তাদের মধ্যেই একজনকে সিংহাসনে বসাবেন স্থির করলেন।

সম্রাট আলমগীরের পৌত্র বিদার-দিল্‌ ছিলেন বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ।

তাকেই ঠিক করলেন আবদুল্লা খাঁন।

সেনাপতি কাদির-দাদ।

বিদার-দিল-কে নিয়ে আসবার ভার পড়ল তার উপর। দুর্গের এক পাশে বিদার-দিল নজরবন্দী হয়ে ছিলেন। লালকেল্লায় গণ্ডগোল দেখে তিনিও ভয় পেয়েছিলেন। ঘরের দিকে সৈন্য আসতে দেখে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কাদির-দাদ বাড়ীর সামনে এসে শাহজাদাকে খুঁজলেন। জানালেন তাঁকে সিংহাসনে বসান হবে।

কিন্তু বিদার-দিলের বেগমেরা ভাবলেন শাহজাদাকে বুঝি হত্যা করা হবে।

তারা শাহজাদাকে লুকিয়ে রাখলেন। কাদির-দাদের হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করলেন শাহাজাদাকে রেহাই দেওয়া হোক।

সময় নেই তখন কাদির-দাদের।

রাজনীতিতে হৃদয়ের স্থান কোথায়?

দরজা ভেঙে গৃহে প্রবেশ করলেন তিনি।

কিন্তু গোপন-কক্ষ থেকে বিদার-দিলকে খুঁজে বের করা গেল না।

দিন তখন শেষ হয়ে আসছে।

হুসেন আলী অস্থির হয়ে কামান দাগছেন।

আর দেরী করবার উপায় নেই।

কিন্তু উপায় ?

হঠাৎ সেনাপতির নজরে পরল; এক সুদর্শণ যুবক পাশের এক গৃহ থেকে সব লক্ষ্য করছেন।

আকৃতি দেখে মনে হ'ল বাদশাজাদাদের কেউ। পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন হ্যাঁ, বাদশাজাদাই বটে। নাম রফি-উ-দরজাত্। রফি উস্‌শানের পুত্র। সেই মুহূর্তে যে কোন বাদশাজাদাকে পাওয়াই ভাগ্যের কথা।

পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরা অবস্থাতে তাকেই ধরে নিয়ে গেলেন কাদির-দাদ। অনেক প্রতিবাদ করলেন বাদশাহজাদা,—সিংহাসনে তাঁর প্রয়োজন নেই। সিংহাসনের মোহ নেই তাঁর। 'আমাকে ছেড়ে দাও' কেঁদে বললেন তিনি। কিন্তু কোন কথা শুনল না বিদার-দিল। জোড় করে নিয়ে গেল।

কোন আড়ম্বর নয়।

নিতান্ত সাধারণ ভাবে হিন্দুস্থানের নতুন ভাগ্য বিধতা সিংহাসনে বসলেন।

সেই বাদশাকেই একের পর এক আমিরেরা ভেট দিয়ে কুর্নীশ জানাতে লাগলেন।

স্তব্ধ এক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে দেখলেন নতুন বাদশা।

আরো একটু বাকী তখনো।

লাল বাদশার তরুণ স্বপ্নের মূল্য কতটুকু এবার বুঝিয়ে দিতে হবে।

তাকে বন্দী করে নিয়ে আসা তখনো বাকী।

আবদুল্লা, নাজম উদ্দিন আলী আর রাজা রতনচাঁদকে পাঠালেন

হারেমে ফর্‌রুকসিয়রকে বন্দী করে আনতে। বললেন, জীবন্ত কি মৃত তাকে এই মুহূর্তে ধরে আনা চাই।

পাঠান বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হ'ল ওরা।

প্রথম বাদশা হারেমের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হ'ল।

হারেমে এসে পৌঁছল পাঠান বাহিনী।

কিন্তু ফর্‌রুকসিয়র যা পারেন নি, বেগমরা তাই করলেন!

রুখে দাঁড়ালেন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

নাজমউদ্দিন বলল—সরে দাঁড়ান।

—না। উত্তর এল বেগমদের।

পাঠানেরা তরবারি কোষ মুক্ত করল, বাধা দিলেন বেগমরাও।

শেষে বেগমদের সঙ্গেই যুদ্ধ হ'ল।

নির্মম পাঠানেরা বেগমদের দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলল। অসূর্য্যম্পশ্যা নারী, শুধু লোভের দৃষ্টি নয়, লোভের বাস্তব ভোগ্যে পরিণত হ'ল।

কিন্তু ইজ্জত দিয়েও প্রতিরোধ করা গেল না। হারেমে প্রবেশ করল ওরা। ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করল চতুর্দ্দিক।

তবু হারেমে প্রবেশ করলেই কি সন্ধান মেলে? খুঁজে পেলনা বাদশাকে তারা।

বাদশার সন্ধানের জন্য নির্ম্মমভাবে প্রহার করা হ'ল বেগমদের।

এমনকি নতুন বিবাহিত রায় ইন্দর কুনয়ারও বাদ গেলেন না।

চিৎকার করে উঠলেন ফারুক, হায় আল্লা একি নিষ্ঠুর তুমি।

হয়ত ক্ষণকালের জন্য তার প্রার্থনা শুনলেন আল্লা, তাই ফর্‌রুক-সিয়রের সন্ধান মিলল না।

কিন্তু ফর্‌রুকসিয়রের ভাগ্যসূর্য তখন অস্তমিত হয়েছে।

তাকে রক্ষা করবে কে? আল্লা শুধু বিপর্যয়ের মুখে সময়কে একটু ধরে রাখলেন।

কিন্তু সে শুধু ক্ষণকাল।

অবশেষে অন্ধকার এক প্রকোষ্ঠে খুঁজে পাওয়া গেল বাদশাকে।

ফারুকউন্নিসা আর ইন্দর কুনয়ার তাতার দেহরক্ষিণীদের নিয়ে বাধা দিলেন, না—বাদশাকে নিয়ে যেতে পারবে না তোমরা।

একমাত্র কন্যা বাদশা বেগম "পিতার পা জড়িয়ে ধরে থাকলেন—"আব্বাজান যেওনা তুমি।"

কিন্তু রাজনীতির কাছে স্নেহের স্থান নেই।

নির্মম পাঠান বাহিনী সিংহাসনচ্যুত বাদশাকে ধরে ফেলল। তারপর মাটির উপর হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল ওরা বাদশাকে।

শত শত আর্ত চিৎকারে হয়তো পাষান দেওয়াল কেঁপে উঠল, কিন্তু পাঠানদের মন টলল না।

সমস্ত আক্রোষ যেন গিয়ে পড়ল তাদের ফর্‌রুকসিয়রের উপর। নির্মম প্রহারে তারা তাঁকে জর্জরিত করে রক্তাক্ত দেহে নিয়ে দেওয়ানী আমে ফেলল।

সময়ের চাকা তখন ঘুরে গেছে।

আজ যে বাদশা কাল সে ফকির।

বহুদিনের স্বপ্ন দিয়ে রঙিন মধুর সিংহাসন সামনেই দেখতে পেলেন ফর্‌রুকসিয়র।

সেই সিংহাসনে তিনি আজ আর নেই।

তাঁরই সামনে বসে রয়েছেন আর একজন; আর তাকে ঘিরে সঈদ ভাই আবদুল্লা, অজিত সিংহ আর অন্যান্য আমিরেরা।

তাকিয়ে দেখলেন ফর্‌রুকসিয়র, তরুণ এক রক্তবর্ণ যুবক। লাল বাদশা। ওরই মত তিনিও একদিন যৌবনের রঙিন স্বপ্ন নিয়ে দিল্লীর তক্তে তাউসে এসেছিলেন।

কিন্তু…

তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আবদুল্লা কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন প্রাক্তন বাদশার দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ কি···কে জিতল ?

সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

জিতলেন উজির।

সিংহাসনের পাশে ছিল এক সুর্মার বাক্স।

আবদুল্লা খুলতে আদেশ দিলেন।

সুর্মা লাগাবার বড় সূচ বের করা হ'ল।

এতটুকু কাঁপলেন না তিনি, এতটুকু চঞ্চল হলেন না। নির্বিকারে আদেশ দিলেন, ওর চোখ দুটো অন্ধ করে দাও। যে চোখ দিয়ে স্বাধীন হবার রঙিন স্বপ্ন দেখেছিল সে চোখ ভরে এবার শুধু অন্ধকার দেখুক।

সূর্য তখন দিগন্তে রক্তবর্ণ ধারণ করেছেন।

ডুববার আগে শেষবার তখনো তাকিয়ে আছেন পৃথিবীর দিকে।

মানুষ কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারে তিনি দেখতে চান।

চিৎকার করে লাফিয়ে উঠতে চাইলেন ফররুকসিয়র।

কিন্তু তাকে জোর করে দেওয়ানী আমের মাঠে শোওয়ান হ'ল।

তারপর দুটো চোখের মণিতে সূচ ফুটিয়ে দেওয়া হ'ল!

অশ্রু নয়, দুচোখ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল শাহজাদার।

প্রথমটা একটা আগুনের গোলার মত কি দেখলেন তিনি, তারপর একটা নীল দ্যুতি ফুটে উঠল।

সেই বিবাহ বাসরে চকিতে দেখা পান্নার নীল দ্যুতির মত।

তারপর সেই নীলিমা ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল।

সূর্য ডুবে গেল।

হায় আল্লা!

সতের

পার্থিব জগতের সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী।

এমন কি চন্দ্র সূর্য তাও মহাকালের বয়েসের বিচারে বেশীদিন বাঁচবে না।

মানুষের জীবনের তো কথাই নেই।

মহাকালের তুলনায় তার অস্তিত্ব অনুভব করাই কঠিন।

সেই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যে আরো ক্ষণস্থায়ী মানুষের, রূপ-যৌবন।

কিন্তু ক্ষণতম স্থায়ী বুঝি একমাত্র সুখের দিন।

অন্তত সেকথাই দিল্লীর এক অন্ধ প্রকোষ্ঠে বসে ভাবছিলেন এক যুবক।

সে যুবক ফর্‌রুকসিয়র।

দেওয়ানী আমের মাঠেই কাহিনীকে শেষ হতে দেননি সঈদ-ভাই আবদুল্লা।

ইতিহাসে সেই ব্যর্থ জীবনকে আরো একটু বিলম্বিত করেছিলেন তিনি।

লাল কেল্লার এক পাশে ত্রিপলীর অন্ধকূপ।

সেখানে বন্দী করে রাখা হ'ল হতভাগ্য শাহজাদাকে।

সেই অন্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে একমাত্র সঙ্গী তার খাবারের একটি পাত্র আর এক ঘড়া পানী।

সহস্র বেগম পরিবৃত হয়ে যে বাদশা একদিন জীবনের রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরই এই পরিণাম!

সেই অন্ধকূপে পায়চারী করতে করতে সেই পরিণামের কথাই ভাবেন শাহজাদা।

কেন এমন হ'ল তার ?

এর জন্য দায়ী কি ভাগ্য ? এটা আল্লার বিধান ?

না, আল্লার বিধান নয়।

স্পষ্ট শাহজাদা সে কথা বুঝতে পারেন।

মনে পড়ে প্রিয়তমা পত্নী ফারুকউন্নিসার সেই কাতর চোখ দুটি।

সিংহাসনে বসতে মানা করেছিল সে।

সিংহাসনে যখন বসেছিলেন তিনি তখন তাকে উপেক্ষা করতেও মানা করেছিল সে।

সিংহাসনে বসলে বাদশা হওয়া যায়, কিন্তু ফিরে আসা যায় না।

ফিরতে চাইলে মৃত্যু।

ফর্‌রুকসিয়র দায়িত্বকে এড়াতে চেয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সেই সব কথা মনে পড়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে শাহজাদার।

আরো দ্রুত পায়চারী করতে থাকেন তিনি।

আর তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ছটপট করেন তিনি সেই অন্ধকারের বেষ্টনী থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

কিন্তু উপায় নেই।

কোরাণ মুখস্ত ছিল শাহজাদার, ঘুরে ঘুরে দিনরাত সেই কোরাণ আবৃত্তি করতেন তিনি।

কিন্তু শাহজাদাকে বাঁচতে দেবার ইচ্ছে ছিল না সঈদ ভাইদের।

খাবার মধ্যে তারা প্রচুর নূন মিশিয়ে দিতে লাগলেন।

ফলে পেটে যন্ত্রণা হতে লাগল শাহজাদার।

উদরাময় হল তাঁর।

সেই পানী-বিহীন অন্ধকূপে অশৌচ হয়ে রইলেন শাহজাদা।

কোরাণ পাঠ থেমে গেল।

কিন্তু জীবনের স্পন্দন তখনো তার শেষ হয়নি।

শুধু ঘুরতে লাগলেন পাগলের মত।

মুক্তি, মুক্তি পেতেন যদি !

হঠাৎ একদিন সেই ঘুর্ণীর মধ্যে আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলেন শাহজাদা যে, তিনি যেন আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছেন।

তাহলে ? তাহলে কি তার চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ হয়নি ?

পরীক্ষা করবার জন্য যেখানেই আলো দেখেন সেখানেই ছুটে যান বাদশা।

অন্ধকূপেও সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রের পথে আলো যেত।

সেই আলো দেখলেই পাগলের মত সেখানে ছুটে যেতেন ফর্‌রুকসিয়র।

এটা চোখে পড়ল প্রহরীর। পাহারা দিচ্ছিল মহম্মদ বেগ।

সংবাদ নিয়ে সে সঈদ ভাইদের কাছে আসবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

দেওয়ানী আমে স্পর্ধার উদ্ধত শীরে যখন ওরা বসে রয়েছেন, একদিন মহম্মদ বেগ গিয়ে হাজির হ'ল।

সঈদ ভাইয়েদেরই বিশ্বস্ত প্রহরী সে।

তাকে দেখেই আবদুল্লা বললেন, কি সংবাদ বেগ ? দুশমনটা দেখে গিয়েছে কি ?

—না জনাব।

—সেকি ! আরো জ্বালাতে চায় ?

অনুগত ভৃত্য প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল শুধু একটু।

মহামূল্যবান সংবাদ এনেছে সে প্রভুদের জন্য, তাই তার বড় আনন্দের দিন।

সে বলল, জনাব।

—বল ?

—বাদশা আবার চোখ ফিরে পেয়েছেন।

যেন প্রায় লাফিয়ে উঠলেন আবদুল্লা খাঁ, তাই নাকি !

—হ্যাঁ।

—কি করে বুঝলে ?

—বেগ বললে, কয়েকদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, আলো দেখলেই বাদশা সেদিকে ছুটে যান।

—তারপর ?

—কি যেন খোঁজেন। দেয়াল বেয়ে উঠবার চেষ্টা করেন।

একটু আশ্চর্য্য, আবার একটু শঙ্কিতও হলেন আবতুল্লা, বললেন, —তুমি একটু লক্ষ্য রাখবে তো। ভাল করে দেখে আমাকে জানাবে।

এই দায়িত্বলাভ করে কৃতজ্ঞতায় যেন নুইয়ে পড়ল বেগ।

সেলাম করে চলে গেল সে।

কিন্তু সে দিনই সে নতুন খবরের সন্ধান পেল।

অন্ধকূপের উচ্চদিকের দ্বার খুলে নিচে তাকাবার চেষ্টা করতেই এক ঝলক আলো গিয়ে পড়ল সেখানে। আলোর আকাঙ্ক্ষায় ক্ষুধিত তুটো চোখে যেন তা হঠাৎ বিপ্লব ঘটিয়ে দিল।

হঠাৎ, আলো লক্ষ্য করে উন্মত্ত হয়ে ছুটতে চাইলেন বাদশা। কিন্তু আলোর পথ উর্দ্ধে, নাগালের বাইরে। বাদশা সেই উর্দ্ধে শুধু চোখ নয়, কানও পেতেছিলেন। বুঝলেন কেউ সেখানে রয়েছে। চিৎকার করে ডাকলেন, কে ওখানে ?

ধূর্ত্ত মহম্মদ বেগের উত্তর এল, আমি, দ্বাররক্ষক।

দ্বাররক্ষক! তাহলে ওখানে মানুষ আছে! হৃদয় আছে! শুধু আলো নয়, আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। বাদশা চিৎকার করে উঠলেন, ও ভাই খোল, তুয়ার খোল, আমাকে আলোর মধ্যে নিয়ে যাও।

—কেন ?

—আমি যে বড় ব্যথা পাচ্ছি।

—বেগ বলল, কি দেবে তোমাকে মুক্তি দিলে ?

—চিৎকার করে উঠলেন বাদশা, সব, সব, সব। উজির করব

তোমাকে। দশ হাজারী মনসবদার করব। শুধু আমাকে মুক্তি, শুধু আমাকে মুক্তি দাও ভাই।

—তুমি পালাতে পারবে না।

—বাদশা বললে, পারব, পারব, তুমি শুধু গভীর রাত্রে এসে দোর খুলে দিও আমাকে। দেবে?

মনে মনে কি এক নিষ্ঠুর কৌতুকের কথা ভেবে হাসল মহম্মদ বেগ। বলল, অপেক্ষা কর, আসব আমি। চিৎকার করে ডাকলেন বাদশা, আসবে, আসবে তুমি?

—নিশ্চয়ই!

নতুন খবর আর খবরের বিনিময়ে উজ্জ্বল স্বর্ণমুদ্রা। চোখ ছুটো চক্ চক্ করে উঠল মহম্মদ বেগের। বরাবর চলে এল সে আবত্নল্লা খানের কাছে। দীর্ঘ সেলাম ঠুকে দাঁড়াল বেগ প্রভুর সামনে।

খাঁ সাহেব বললেন, কি খবর?

—বেগ বলল, জনাব, বাদশা মুক্তি চায়।

সমস্ত ঘটনা ধীরে ধীরে ভেঙে বলল মহম্মদ বেগ আবত্নল্লা খাঁর কাছে।

আবত্নল্লা বললেন, বেগ, তুমি সত্যি কাজের লোক। তোমাকে আর কারাগারে নয়, এবার অন্যত্র বদলী করব। হাজার তঙ্কা তোমার পুরস্কার।

কিন্তু বাদশাকে মুক্তি দিতে হবে তোমাকেই!

প্রথম কথাটা বুঝতে না পেরে একটুখানি আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে ছিল বেগ।

খাঁ সাহেব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, মুক্তি দিতে হবে। এমন মুক্তি, যাতে, পার্থিব বন্ধনে আর বাধা না পড়তে পারে বাদশা।

এবার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলো মহম্মদ। বলেছিল সে, পারব জনাব, আপনার যে কোন হুকুম আমি তামিল করতে পারব। প্রয়োজন হ'লে জীবন দেব আপনার জন্য।

আবহুল্লা বলেছিলেন, বেশ যাও, তবে বাদশাকে মুক্তি দিয়ে এস।

সেলাম জানিয়ে চলে গিয়েছিল মহম্মদ বেগ।

মহম্মদ বেগ সেই যে আশার আলো দেখিয়ে গেছে—সেই পথেই মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন বাদশা। আসবে, আসবে, মহম্মদ বেগ আবার আসবে। এই অন্ধ কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে সে তাকে পরিচিত পৃথিবীতে আবার নিয়ে যাবে।

এলও সে। কিন্তু একা এল না এল কুৎসিৎ-দৃষ্টি একদল লোক সঙ্গে নিয়ে—লোক নয়, ওরা ঘাতক

সেই ঘাতকরাও ত্রিপালীণ অন্ধ কূপের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কি এক চিৎকারে যেন চমকে উঠলো তারা। হ্যাঁ চিৎকার, চিৎকার করে কে যেন ডাকছে খোদাতালাকে, সেই করুণ চিৎকারের মধ্যেও কিসের একটা প্রবল প্রতিবাদ ছিল যেন শুনে বলিষ্ঠ ঘাতকেরাও প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে ভয় পেল। এই তীব্র কণ্ঠ যার তার সঙ্গে তারা পারবে কি? দরজায় কান দিয়ে তারা ব্যাপারটা বঝবার চেষ্টা করল। কিন্তু হঠাৎ যেন সব চুপ হয়ে গেল এবং সেই নিশ্চুপ ভাব দেখে ওরা ভাবল হয়তো শাহাজাদা মৃত।

ভরষা ক'রে দরজা খুলল।

কিন্তু শাহজাদা ঘুমান নি বা জীবন হারাণ নি।

বেঁচে ছিলেন তিনি।

জীবনে প্রথম এবং শেষ দিনের জন্য ফর্‌রুকসিয়র ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পেলেন। বুঝলেন মহম্মদ বেগ এসেছে তবে জীবন দিতে নয়, নিতে।

মরতে যখন হবেই, বীরের মতন মরবেন।

আক্রমণ করলেন তিনি ঘাতকদের।

কিন্তু ওরা ততক্ষণ শাহ্জাদার গলায় দড়ির ফাঁস লটকে দুধার থেকে টানতে আরম্ভ করেছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

বিরাট বপু ফররুকসিয়র অবশেষে লুটিয়ে পড়লেন।

সেই মৃত দেহের বুকে নির্মম ছুড়ি বসল ঘাতকদের। তাং সেই অন্ধকূপ থেকে মৃত দেহ বাইরে আনা হ'ল।

ক্ষতবিক্ষত দেহটা বিভৎস দেখাচ্ছে।

চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে এসেছে যেন।

সমস্ত মুখে নীল ছায়া, নির্মম ভীতি।

মনে হয় কিছু দেখে ভয় পেয়েছেন যেন শাহজাদা।

মৃত্যুর মুহূর্তে সেই পান্নার নীলদ্যুতি দেখেছিলেন তিনি। স পেয়ে বেগমেরা শেষবার তাদের প্রিয়তমকে দেখতে এলেন।

পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদলেন তারা।

কিন্তু কান্না কি জীবনকে ফিরিয়ে দিতে পারে?

পারে না।

তাই একদিন লাল যৌবনের স্বপ্ন নীল বেদনায় প হ'ল।